প্রকাশনার ৮২ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ০৮ ❖ ২৭ ফেব্রুয়ারি - ৫ মার্চ, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

তপস্যাকাল

ভস্ম থেকে ভস্ম বুধবার অতঃপর প্রায়শ্চিত্তকাল

ভস্ম বুধবার ও ইস্টার সান্‌ডে গণনা পদ্ধতি

তপস্যাকালে আধ্যাত্মিক যাত্রায় আমরা

তপস্যাকালীন অনুচিন্তন: নিজেকে জয় করা

ঐশধামে যাত্রার ষষ্ঠ বার্ষিকী

তোমাকে ছাড়া আমরা বড় অসহায়ঃ বেঁচে আছি শুধু তোমার স্মৃতি নিয়ে

প্রয়াত খ্রীষ্টফার সমীর গমেজ

জন্ম: ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২ মার্চ, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ
রাঙ্গামাটিয়া পূর্বপাড়া
রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী

বছর ঘুরে ফিরে এলো সেই বেদনাঘন দিন ২ মার্চ। ছয়টি বছর পার হয়ে গেল তুমি আমাদের ছেড়ে পরম পিতার অনন্তধামে আশ্রয় নিয়েছো। তোমার এভাবে হঠাৎ চলে যাওয়াটা আমাদের এখনও কাঁদায়। তোমার এ যাত্রার কথা ঘুণাক্ষরেও আমরা আঁচ করতে পারিনি। একটি মুহূর্তের জন্যও আমরা ভুলিনি তোমায়, ভুলবো না কোনদিন। তোমার স্মৃতি চিরভাস্বর আমাদের সবার হৃদয়ে। তোমাকে চিরতরে হারিয়ে আমরা হয়ে পড়েছি বড় অসহায়, অভিভাবকহীন। তুমি জীবিত অবস্থায় তোমার আদরের নাতীন শুধু সুজানাকে দেখে গিয়েছ। এখন কিন্তু তোমার দুই ছেলের সংসারে ৩জন নাতীন ও এক নাতী। ওরা তোমাকে 'খ্রীষ্ট ভাই' বলে প্রতিনিয়ত খোঁজে। ঘরে তোমার ছবির দিকে তাকিয়ে থাকে। অতি সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়াতে তোমার আদরের মেয়ে বৃষ্টির ঘর আলো করে আরো একজন নাতীনের জন্ম হয়েছে। সময়ের ব্যবধানে পরিবারের সদস্য/সদস্যা সংখ্যা বেড়েছে। সবাই আছে শুধু তুমি নেই। প্রতিক্ষণে মানসপটে ভেসে ওঠে তোমার আদরমাখা মুখ। তুমি রয়েছ মিশে স্মৃতির পাতায়, তোমার কথায় ও তোমার ভালবাসার স্পর্শে।

প্রয়াত খ্রীষ্টফার অসাধারণ মেধা, অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফলে খুব সাধারণ অবস্থা থেকে উচ্চ শিখরে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিল। আমাদের বাবা/দাদু ছিল সুশিক্ষিত, সৎ, পরিশ্রমী, কর্তব্যনিষ্ঠ, মৃদুভাষী, ধর্মভীরু ও নীতিবান মানুষ। আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী ও উন্নয়ন সাহায্য সংস্থা ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ-এর ফাইন্যান্স ও এডমিনিষ্ট্রেটিভ ডিরেক্টর পদে বহু বছর সেবাদান করে গেছে। চাকুরীর পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডেও খ্রীষ্টফারের সরব ভূমিকা ছিল।

বাবা/দাদু, স্বর্গরাজ্য থেকে তুমি আমাদের জন্য প্রার্থনা করো যেন তোমার শিক্ষা, সততা, কর্মনিষ্ঠতা, নীতি-আদর্শ ও তোমার রেখে যাওয়া অসম্পূর্ণ স্বপ্নগুলো বাস্তবায়ন করে তোমাকে আমাদের মাঝে চিরদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারি।

শোকাহত পরিবারের পক্ষে,

বড় ছেলে-ছেলে বৌ: সজল যোসেফ - বীথি সিসিলিয়া
ছোট ছেলে-ছেলে বৌ: সুজন ডমিনিক - সিলভিয়া
মেয়ে-মেয়ে জামাই: বৃষ্টি স্কলাস্টিকা - মামুন
নাতনী: সুজানা, সায়ানা, সামারা ও আরিয়া
নাতী: সৃজন
স্ত্রী: সবিতা জসিন্তা গমেজ
ভাই: ফাদার সুব্রত বনিফাস গমেজ

বিজ্ঞ/৬৩/২০২২

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮২, সংখ্যা : ০৮
২৭ ফেব্রুয়ারি - ৫ মার্চ, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
১৪ - ২০ ফাল্গুন, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
ডেভিড পিটার পালমা
ছনি মজেছ রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদকীয়

তপস্যাকালের তপস্যা হোক সচেতনতায় ও স্বতঃস্ফূর্ততায়

খ্রিস্টমণ্ডলীর পূজন বর্ষে গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় তপস্যাকাল। ৪০ দিনের এই সময়কালে খ্রিস্টবিশ্বাসীরা নিজেদেরকে আরো গভীরভাবে জানতে ও চিনতে পারে। অনুভব করতে পারে নিজেদের দুর্বরতা, ভঙ্গুরতা ও পাপময়তা। এই মানবীয় দুর্বলতা ও ক্ষয়িষ্ণুতার কথা স্মরণ করতে কপালে ভস্ম লেপন করে শুরু করা হয় তপস্যাকালের আধ্যাত্মিক যাত্রা। এই যাত্রাতে অনুতাপ ও প্রায়শ্চিত্তের মধ্যদিয়ে আমরা লাভ করি ঈশ্বরের দয়া-ভালবাসা ও অন্তরের শুদ্ধতা। তপস্যাকালের একটি আহ্বান হলো মন পরিবর্তনের আহবান। মনপরিবর্তন মানে নিজের দিকে ফিরে তাকানো, ভাই মানুষের দিকে ফিরে তাকানো, ঈশ্বরের দিকে ফিরে তাকানো। ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের দুর্বলতা ও পাপের জন্য ক্ষমা চেয়ে ভাই মানুষের সাথে পুনর্মিলিত হবার প্রয়াস তপস্যাকালের একটি তপস্যা হতে পারে। অনুতাপে দগ্ধ হয়েই মন পরিবর্তন করতে হয়। অনুতাপ করতে হয় কেননা আমরা সবাই ঈশ্বরের দানের অপব্যবহার করে পাপ করছি অহরহ। পাপের ফলে নষ্ট করি ঈশ্বর ও মানুষের সাথে সুসম্পর্ক। আর ঈশ্বরের ভালবাসা থেকে দুরে সরে যাই বলেই অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আসতে হয়। সত্যিকার অনুতাপ আমাদেরকে ঈশ্বরের ভালবাসা বুঝতে সহায়তা করে।

পোপ ফ্রান্সিস তার পোপীয় শাসনামলে তপস্যাকালকে পুনরুদ্ধার, পুনর্নবীকরণ এবং রূপান্তরের সময়, ঈশ্বরের ভালবাসা গ্রহণ ও জীবনের দিক-নির্দেশনা পুনঃআবিষ্কারের একটি সময় বলে বর্ণনা করেছেন। ৪০ দিনের এই যাত্রা এ বছর শুরু হবে ২ মার্চ এবং শেষ হবে ১৪ এপ্রিল পুণ্য বৃহস্পতিবার সূর্যাস্তের পর। তপস্যাকালের এই সময় পুনরুত্থান উৎসব উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে নিজেকে প্রস্তুত করার একটি অপূর্ব সুযোগ দান করে। যে সময়ে খ্রিস্টবিশ্বাসীরা প্রার্থনা, উপবাস এবং দয়াকাজের মধ্যদিয়ে খ্রিস্টকে আরো ভালো ভাবে জানতে পারে এবং তাঁর ইচ্ছা আরো বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করতে পারে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে প্রার্থনা, দয়া-দান ও উপবাসের নবায়ন ঘটানোর মধ্যদিয়ে আমরা আমাদের জীবনের পরিবর্তন ঘটাতে পারি। সবসময়ই আমরা প্রার্থনা, দয়া ও উপবাস বা ত্যাগস্বীকার করতে পারি। এগুলো আমাদেরকে আধ্যাত্মিক ও নৈতিকভাবে দৃঢ়তা দান করে ও মন্দতার উপর বিজয়ী হতে সহায়তা করবে।

সবধর্মেই কৃচ্ছতাসাধন ও ত্যাগস্বীকারের কথা বলা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে নিয়ম করে তা আরোপও করা হয়। খ্রিস্টধর্মেও ভস্ম বুধবার ও পুণ্য শুক্রবার ১৮ থেকে ৫৯ বছরের মধ্যকার খ্রিস্টবিশ্বাসীর উপবাস রাখা এবং মাংসাহার ত্যাগ করা অত্যাবশ্যকীয়। এছাড়াও তপস্যাকালের প্রতি শুক্রবারে ১৪ বছরের বেশি বয়স্কদের জন্য মাংসাহার ত্যাগ আবশ্যকীয়। স্থানীয় মণ্ডলী হিসেবে বাংলাদেশ মণ্ডলী মাংস, মাছ ও ডিমও ত্যাগ করার আহ্বান রাখে। উপবাস বিষয়ে মণ্ডলীর নির্দেশনা যথাযথভাবে পালন করা একজন খ্রিস্টবিশ্বাসীর নৈতিক দায়িত্ব। নিয়ম-নীতি থাকলেও স্বাধীনভাবেই প্রার্থনা, দয়াদান ও উপবাস করতে অনুপ্রাণিত করে মণ্ডলী। আর তাই উপবাসের কোনো কঠিন নিয়ম দেয় না। নিয়ম না থাকলেও অনেকেই ৪০ দিন ইচ্ছাকৃতভাবে উপবাস থাকেন, নিরামিষ খান এবং গরীব-দুঃখীদের পাশে দাঁড়ান। ভোগ-বিলাসিতাবাদ ও আরাম-আয়েসের সংস্কৃতির বিরুদ্ধে জয়ী হতে হলে তপস্যাকালকে যথাযথভাবে পালন করতে হবে। শুধু শুক্রবার নয় তপস্যাকালের দিনগুলোতে আমরা যেন কোন কারণেই ঘটা করে ধর্মীয়, সামাজিক বা পারিবারিক অনুষ্ঠান আয়োজন না করি। কেউ তা করলে আমি সচেতনভাবে তা থেকে বিরত থাকি। সম্ভবপর হলে অন্যদেরকেও বিরত থাকতে পরামর্শ দান করি। এমনিভাবে ছোট ছোট ত্যাগস্বীকারের মাধ্যমে আমরা আত্মনিয়ন্ত্রণ অর্জন করতে পারি। †

নিজ নিজ ফল দ্বারাই প্রতিটি গাছ চেনা যায়। লোকে তো কাঁটাগাছ থেকে ডুমুরফল পাড়ে না, শেয়ালকাঁটা থেকেও আঙুর তোলে না। - **লুক ৬:৪৩**

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

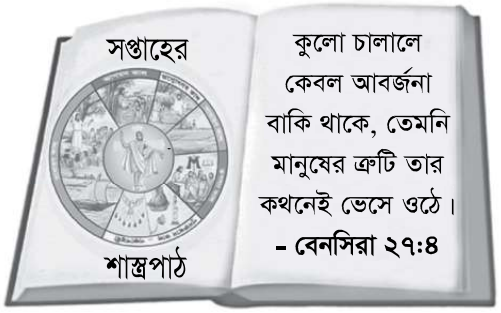

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ
২৭ ফেব্রুয়ারি - ৫ মার্চ, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

২৭ ফেব্রুয়ারি, রবিবার

বেন-সিরা ২৭: ৪-৭, সাম ৯২: ১-২, ১২-১৫, ১ করি ১৫: ৫৪-৫৮, লুক ৬: ৩৯-৪৫

২৮ ফেব্রুয়ারি, সোমবার

১ পিতর ১: ৩-৯, সাম ১১১: ১-২, ৫-৬, ৯-১১, মার্ক ১০: ১৭-২৭

১ মার্চ, মঙ্গলবার

১ পিতর ১: ১০-১৬, সাম ৯৮: ১-৪, মার্ক ১০: ২৩, ২৮-৩১

২ মার্চ, বুধবার

যোয়েল ২: ১২-১৮, সাম ৫১: ১-৪, ১০-১২, ১৫,
২ করি ৫: ২০--৬: ২, মার্ক ৬: ১-৬, ১৬-১৮

৩ মার্চ, বৃহস্পতিবার

২ বিব ৩০: ১৫-২০, সাম ১: ১-৪, ৬, লুক ৯: ২২-২৫

৪ মার্চ, শুক্রবার

ইসা ৫৮: ১-৯ক, সাম ৫১: ১-৪ক, ১৬-১৭, মথি ৯: ১৪-১৫

৫ মার্চ, শনিবার

ইসা ৫৮: ৯খ-১৪, সাম ৮৬: ১-৬, লুক ৫: ২৭-৩২

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২৭ ফেব্রুয়ারি, রবিবার

+ ১৯৩৩ ফাদার যেরোলামে লাজ্জারোনি পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৯১ ব্রাদার লুইস লেডুক সিএসসি (চট্টগ্রাম)

২৮ ফেব্রুয়ারি, সোমবার

+ ১৯৭৬ ফাদার ইউজিন পইরিয়ের সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮৬ সিস্টার এম. উইনিফ্রেড আরএনডিএম
+ ২০০৯ সিস্টার মেরী শান্তি এসএমআরএ

১ মার্চ, মঙ্গলবার

+ ১৯৯১ সিস্টার এম. কর্ণেলিউস আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)

২ মার্চ, বুধবার

+ ১৯৮৫ সিস্টার বার্ণার্ড আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৬ সিস্টার মেরী সান্ত্বনা এসএমআরএ (ঢাকা)

৪ মার্চ, শুক্রবার

+ ১৯৪৪ ফাদার রেমন্ড মাসার্ট সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৫৫ সিস্টার মেরী কলেট পিসিপিত্র (ময়মনসিংহ)
+ ১৯৬৫ ফাদার জন হেনেসী সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৮৭ ব্রাদার ম্যাথিও যোসেফ গারা সিএসসি

ধারা-৩

খ্রীষ্টপ্রসাদ সংস্কার

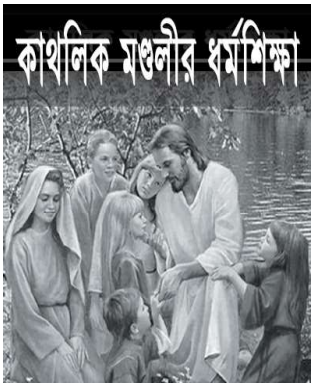

১৩৫৫: মিলন-প্রসাদগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয় প্রভুর প্রার্থনা ও রুটি খণ্ডনের পর, যেখানে ভক্তবিশ্বাসী 'স্বর্গীয় রুটি' এবং 'পরিত্রাণের পাত্র', খ্রীষ্টের দেহ ও রক্ত গ্রহণ করে, যা খ্রীষ্ট 'জগতের জীবনের জন্য' দান করে গেছেন। যেহেতু ও রুটি ও দ্রাক্ষারস খ্রীষ্টপ্রসাদে পরিণত করা হয়েছে (প্রাচীন একটি বর্ণনা অনুসারে 'eucharisted') "আমরা এই খাদ্যকে বলি খ্রীষ্টপ্রসাদ, এবং কেউই এতে অংশগ্রহণ করতে পারে না যদি যে বিশ্বাস না করে যে, আমরা যা শিক্ষা দেই তা সত্য, যদি যে পাপের ক্ষমার জন্য দীক্ষাস্নান ও নবজন্ম গ্রহণ ক'রে না থাকে এবং খ্রীষ্টের শিক্ষা অনুসারে জীবন যাপন না করে।"

॥৬॥ সংস্কারীয় যজ্ঞবলি: কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন, স্মারক-অনুষ্ঠান, উপস্থিতি

১৩৫৬: আদিযুগ থেকেই খ্রীষ্টভক্তগণ খ্রীষ্টপ্রসাদ সংস্কার এমনই এক পদ্ধতিতে সম্পন্ন করে আসছে যার ফলে, সময় ও উপাসনা-অনুষ্ঠানের বিভিন্নতা সত্বেও তার সত্তাগত বৈশিষ্ট্য পরিবর্তিত হয়নি, এর কারণ আমরা জানি যে, প্রভু তাঁর যাতনাভোগের প্রাক্কালে যে নির্দেশ দিয়েছেন, "তোমরা আমার স্মরণার্থে তেমনটি কর', সেই নির্দেশ পালনে আমরা দায়বদ্ধ।

১৩৫৭: প্রভুর বলিদানের স্মারক-অনুষ্ঠান ক'রে আমরা তাঁর নির্দেশ পালন করি। এটা করার মধ্যদিয়ে, আমরা পিতার নিকট অর্পণ করি তা-ই যা তিনি নিজেই আমাদের দিয়েছেন; : তাঁর সৃষ্টির দানসমূহ, অর্থাৎ রুটি ও দ্রাক্ষারস, যা পবিত্র আত্মার শক্তিতে এবং খ্রীষ্টের বাক্য দ্বারা, খ্রীষ্টের দেহ ও রক্তে পরিণত হয়েছে। খ্রীষ্টকে এভাবে প্রকৃত ও রহস্যময়ভাবে উপস্থিত করা হয়।

১৩৫৮: সেজন্য নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যে খ্রীষ্টপ্রসাদকে আমাদের বিবেচনা করতে হবে;

-কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন ও পরমপিতার মহিমাস্তুতি;
-খ্রীষ্ট ও তাঁর 'দেহের' বলিদানের স্মারক-অনুষ্ঠান;
-তাঁর বাণী ও তাঁর আত্মার শক্তিতে খ্রীষ্টের উপস্থিতি।

সবার চেনামুখ শিপ্রা প্যারিস আর নেই

আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ও বাণীদীপ্তি'র নিয়মিত নৃত্য শিল্পী শিপ্রা প্যারিস গত ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রিস্টাব্দে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ঈশ্বর তার আত্মাকে চিরশান্তি দান করুন।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের বাণীদীপ্তিতে ও বাণীদীপ্তি পরিবেশিত বিটিভির বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং মাণ্ডলিক বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মে নৃত্য শিল্পী শিপ্রার ছিল সরব পদচারণা।

বাণীদীপ্তির সুদীর্ঘ দিনের একজন বিশ্বস্ত স্বেচ্ছাসেবী ও শুভাকাঙ্ক্ষীর তিরোধানে প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, বিশেষ করে খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র পরিবারের সকলে শোকে মুহ্যমান। শোকসন্তপ্ত শিপ্রা প্যারিসের পরিবার ও খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র পরিবারকে দয়ালু ঈশ্বর এ ভীষণ বিয়োগ ব্যথা বহন করার শক্তি দান করুন।

তপস্যাকালের আধ্যাত্মিক যাত্রায় আমরা

ব্রাদার প্রদীপ প্লাসিড গমেজ সিএসসি

খ্রিস্টমণ্ডলীর উপাসনাচক্রের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো তপস্যাকাল। ঈশ্বর মানুষকে ভালোবেসে তাঁর প্রতিজ্ঞানুসারে মানুষের মুক্তির জন্য মানুষের কাছে নেমে আসেন। ঈশ্বরের দেহধারণেই মানুষের জীবনে পরিপূর্ণভাবে মুক্তি আসেনি। ঈশ্বরের দেহধারণে মানুষের সামনে মুক্তির একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়; কিন্তু এটাই শেষ নয়। যিশুর পরিপূর্ণ প্রেরণকর্ম হলো- দেহধারণ, যাতনাভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থান। যিশু সকল মানুষের পাপের জন্য নিজের জীবন ক্রুশের উপর সমর্পণ করেন, মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে সমাধি দেওয়া হয় অর্থাৎ তিনি মানুষের সকল পাপ-তাপ নিয়ে কবরস্থ হন। অতঃপর সকল পাপের কালিমা থেকে সকলকে মুক্ত করে তৃতীয় দিনে মৃত্যুকে জয় করে পুনরুত্থান করেন অর্থাৎ সকল মানুষকে নতুন আধ্যাত্মিক পুনরুত্থিত জীবন দান করেন। যার মাধ্যমে মানুষের সাথে ঈশ্বরের নতুন সন্ধি স্থাপিত হয়। মানুষের জীবনে আধ্যাত্মিক মুক্তি আসে।

ঈশ্বরের দিক থেকে তিনি তাঁর প্রেরণকর্ম সম্পন্ন করে মানুষের সাথে সন্ধি স্থাপন করেছেন। এতেই সকল মানুষের আধ্যাত্মিক মুক্তির নিশ্চয়তা দেওয়া সম্ভব নয়; প্রভুর কাজ প্রভু করেছেন এবং প্রতিনিয়ত করে যাচ্ছেন। প্রতি মুহূর্তে তিনি আমাদের হৃদয়ে কড়া নাড়ছেন। এখন প্রত্যেক মানুষের দায়িত্ব হলো স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজের পবিত্রীকরণের জন্য সাড়াদান।

পবিত্রীকরণের কাজটি হলো মণ্ডলীর একটি বড় ও গুরুত্বপূর্ণ প্রেরণকর্ম। খ্রিস্টমণ্ডলীর উপাসনাবর্ষের তপস্যাকালের এ গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আমাদের সবারই যিশুর পৃথিবীতে আগমন, বিশেষ করে তাঁর ক্রুশ বহন, ক্রুশের উপর তাঁর যাতনাভোগ এবং মৃত্যু নিয়ে প্রতিদিন ধ্যান ও প্রার্থনা করা প্রয়োজন। এ সময় আমাদের সবারই জীবন সম্পর্কে, জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। এ সময়টিকে আমাদের জীবনের বিশেষ আশীর্বাদ হিসাবে নেওয়া কর্তব্য। নিজেদেরকে সৌভাগ্যবান বলে উপলব্ধি করা প্রয়োজন কারণ ২০২২ খ্রিস্টবর্ষের এ সময়টি আমার জীবনের একটি উপহার। নিজেদের জীবনের সবল ও দুর্বল দিকগুলো আবিষ্কার করা প্রয়োজন। সবল দিকগুলোর জন্য যিশুর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও দুর্বল দিকগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেন যিশুর আশীর্বাদে ধীরে-ধীরে, ধাপে-ধাপে সকল দুর্বলতা বা পাপময়তা বাদ দিয়ে যিশুর প্রদত্ত মুক্তির আনন্দ আস্বাদন করতে পারি।

২০২২ খ্রিস্টবর্ষের এ তপস্যাকালে আমরা আমাদের খ্রিস্টীয়-বিশ্বাসের জীবনে বেড়ে ওঠে স্বর্গরাজ্যের পথে চলার জন্য যে বিষয়গুলো করতে পারি সেগুলো হলো:

- আমরা সৃষ্টির অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাণী, আমরা মানুষ। আমাদের জীবনটি ঈশ্বরের দান। আমাদের জীবনটি ঈশ্বরের আশীর্বাদে পরিপূর্ণ। আমাদের জীবনে এবং আমাদের সমস্ত কাজ ও চিন্তায় ঈশ্বরকে দেখতে পারি। আমাদের মধ্যে যেন একটা প্রবল কৃতজ্ঞতার ভাব থাকে, কারণ আমরা তো আমরা নই বরং আমরা ঈশ্বরেরই এক একটি অমূল্য দান। আমরা মূল্যবান এবং ঈশ্বর আমাদেরকে ভালোবাসেন। তপস্যাকালে আমাদের ধ্যানে-জ্ঞানে, চিন্তা-চেতনায় আমাদের অস্তিত্ব নিয়ে, আমাদের জীবনের চরম লক্ষ্য নিয়ে ভাবতে পারি; যে ভাবনা আমাদেরকে পবিত্র জীবনযাপন করতে ও পবিত্র হতে অনুপ্রাণিত করবে। আমাদের জীবনের ইতিবাচক দিকগুলো বেশি বেশি দেখতে পারি। প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের মনোভাব যেন ইতিবাচক হয়, সেই চেষ্টা করতে পারি।
- আমরা মাতামণ্ডলী কর্তৃক নির্ধারিত প্রতিদিনের খ্রিস্টযাগের বাইবেলীয় অংশগুলো প্রতিদিন মনোযোগ দিয়ে পাঠ করতে ও সেগুলোর উপর ধ্যান করতে পারি। এতে আমরা শুধু একা নই বরং সমগ্র খ্রিস্টমণ্ডলীর সাথে একাত্ম হয়ে ধীরে ধীরে যিশুর সাথে কালভেরী পর্বতের দিকে যাত্রা করতে পারবো। শুধু খ্রিস্টযাগের বাইবেলীয় অংশ নয় পবিত্র বাইবেলের বাকী অংশ পাঠও আমাদের জীবনে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য অবশ্যই সহায়ক হবে *(সাম ১১৯:১০৫)*।
- আমরা যেন নিয়মিত পরিবারের সকলে মিলে পারিবারিক প্রার্থনা করতে চেষ্টা করি। রবিবারের খ্রিস্টযাগের সাথে সম্ভব হলে অন্যান্য দিনের খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করতে চেষ্টা করতে পারি। প্রতিশুক্রবার ক্রুশের পথে যোগদান করে যিশুর যাতানাভোগ নিয়ে অনুধ্যান করতে পারি। এর সাথে নিজেদের জীবনের ক্রুশ ও যাতনাগুলো আবিষ্কার এবং পবিত্রভাবে তা বহন করার জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে পারি। মাঝেমধ্যে পরিবারের সকলে মিলে বিভিন্ন সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে পারি। এতে পরিবারের সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতি ঘটে।
- আমরা সকলেই নিজ নিজ জায়গায় অবস্থান করে সত্য, সরল, ন্যায্য ও দায়িত্বপূর্ণ জীবনযাপনের মাধ্যমে যিশু খ্রিস্টের সাক্ষ্য বহন করতে পারি। আমাদের জীবন ও ভালোবাসাপূর্ণ দায়িত্ব পালন অন্যদের থেকে ব্যতিক্রম হতে পারে। মানুষকে কষ্ট না দিয়ে কম সময়ের মধ্যে সুন্দর করে আমরা দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে ও মার্জিত ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের কাজে পরোক্ষভাবে প্রভু-বাণী তথা স্বর্গরাজ্যের বাণী প্রচার করতে পারি।
- আমাদের সামর্থ্য অনুসারে পবিত্র মনোভাব নিয়ে গরীব-দুঃখীদের সাহায্য করতে পারি। তার জন্য হয়তবা আমাদের কিছুটা ত্যাগ স্বীকার করতেও হতে পারে। যারা অর্থনৈতিকভাবে অভাবী, অবহেলিত, বন্দি, শরীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ তাদের কথা চিন্তা করা, সম্ভব হলে তাদের কাছে যাওয়া, তাদের কথা শোনা এবং তাদের মঙ্গল প্রার্থনা করা আমাদের কর্তব্য।
- তপস্যাকালের এ পবিত্র সময়ে আমরা প্রতিদিন মন পরীক্ষা করতে পারি যেন প্রতিদিন মন্দতা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারি। আমি আমার দুর্বল দিকগুলো ধীরে ধীরে জয় করতে সক্ষম হতে পারি। নিজেকে ও অন্যকে ক্ষমা করে নিজেকে এবং অন্য ভাই-বোনকে আপন করে ভালোবাসতে পারি। অর্থাৎ দরিদ্রকে ভালবাসার মধ্যদিয়ে আমি যিশু খ্রিস্টকে ভালোবাসতে পারি।
- আমাদের সময় থাকলে ও সম্ভব হলে কিছু কিছু বই পড়তে পারি যে-গুলো আমাদেরকে খ্রিস্টীয় আধ্যাত্মিকতায় বেড়ে ওঠতে সাহায্য করবে। করোনা অতিমারির কারণে যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধই থাকে তবে আমরা যাঁরা শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী আমরা আমাদের নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক পাঠ করার সাথে সাথে অনেক সাধু-সাধ্বীদের জীবনী, ভালো গল্পের বই

ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক বই পড়তে পারি। এ পড়াটা আমাদেরকে পবিত্র চিন্তা করতে এবং সময়ের সদ্ব্যবহার করতেও সহায়তা করবে।

- উপবাস হলো আধ্যাত্মিক জীবনে বেড়ে ওঠার একটি সুন্দর ও পবিত্র মাধ্যম যা হাজার বছরের পুরোনো একটি অনুশীলন। অসংখ্য সন্ন্যাসী ও সাধক উপবাসের মাধ্যমে ত্যাগ স্বীকার করে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেছেন এবং ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। খ্রিস্টমণ্ডলীর এ তপস্যাকালে খ্রিস্টমণ্ডলীয় সকলকে উৎসাহিত করা হয়, উপবাসের মাধ্যমে যিশুর সাথে কালভেরী পর্বতে যাত্রা, যিশুর ক্রুশ বহন ও মৃত্যুর রহস্য ও তাৎপর্য অনুধাবন করতে যা আমাদের আদর্শ জীবন দান করে। আমরা যারা শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ আমরা যেন চেষ্টা করি উপবাস করতে, উপবাসের মাধ্যমে আমরা অনাহারি, অর্ধাহারি মানুষের বাস্তবসতা উপলব্ধি করতে ও বুঝতে পারি।
- খ্রিস্টমণ্ডলীর আধ্যাত্মিক যাত্রার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো অকৃপণে যাদের প্রয়োজন তাদেরকে দান করা। এ দান করাটা হতে হবে উদারভাবে, সম্ভব হলে গোপনে; নাম অর্জনের জন্য নয় *(ইব্রীয় ১৩:১৬)*। শুধু অর্থ বা খাওয়া দিয়ে দান নয়। আমাদের মূল্যবান সময়ের মধ্যে একটু সময় নিয়ে কারো কাজে সহায়তা করতে পারি, কারো দুঃখ-কষ্টের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে পারি, কেউ অসুবিধায় থাকলে বা অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যেতে পারি, কাউকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতে পারি। সম্ভব হলে সামাজিক বা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে বা আয়োজকদের সময় দিতে পারি। মনে রাখতে হবে, যেন এ কাজগুলো নিজের বা পরিবারের প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সেরে পরে করা হয়। এ সেবাকর্মগুলো নিজের নাম জাহির করার জন্য যেন না হয় সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- আমরা আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নয়নের জন্য এ পবিত্র সময়ে যে নেতিবাচক দিকগুলো আমাদের আধ্যাত্মিক, আবেগিক ও মানসিক দিকে বাঁধা স্বরূপ সেগুলো নিরূপণ করে তা জয় করার প্রচেষ্টা চালাতে পারি। যেমন- আমরা কেউ কেউ মুঠোফোন বা কম্পিউটারের প্রতি আসক্ত, আবার কেউ কেউ কোনো পানীয় বা খাবারের প্রতি আসক্ত, কেউ কেউ টাকা-পয়সা, সম্পদ বা ক্ষমতার প্রতি আসক্ত। উক্ত বিষয়গুলো আমাদের অনেককে নিয়ন্ত্রণ করে। কোনো কোনো সময়ে আমরা কথার মাধ্যমেও অন্যের ক্ষতির বা হতাশার কারণ হয়ে থাকতে পারি। তপস্যাকালে চেষ্টা করতে পারি নিজের কথাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে বিশেষ করে যেগুলো অন্যকে আঘাত করে, নিরাশ বা হতাশ করে। আমরা রাতারাতি হয় তো পারব না; কিন্তু প্রতিদিন আন্তরিক চেষ্টা চালালে আমাদের পক্ষে যিশুর সাহায্যে এ বাঁধাগুলো জয় করা সম্ভব। সাধু আগস্টিন একদিনেই তাঁর জীবন পরিবর্তন করতে পারেননি। তিনি একনিষ্ঠভাবে অনবরত চেষ্টা চালিয়ে ছিলেন বলেই সফল হয়েছিলেন এবং এত বড় সাধু হতে পেরেছিলেন।
- যদি কারো সাথে আমাদের সম্পর্ক আশানুরূপ না থাকে, তবে তার সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারি। যিশু চান যেন আমরা দেহ-মন-আত্মায় সুস্থ থাকি, আমরা যেন আনন্দে ও শান্তিতে জীবনযাপন করি আর সেজন্যেই তো আমাদের ত্রাণকর্তা পৃথিবীতে এসেছেন ও আমাদের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন।
- আমরা চেষ্টা করি প্রতি রবিবারে খ্রিস্টযাগে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে। চেষ্টা করি পুনর্মিলন সংস্কার ও নিয়মিত খ্রিস্টপ্রসাদ সংস্কার গ্রহণ করতে। আমরা গভীরভাবে উপলব্ধি করব যে, আমরা খ্রিস্টকে গ্রহণ করার মাধ্যমে খ্রিস্টের রক্ত ও মাংসের অংশ হচ্ছি; আমরা খ্রিস্টের সাথে মিশে যাচ্ছি এবং সমগ্র খ্রিস্টমণ্ডলীর সাথে আমাদের একটি আত্মীক সম্পর্ক গড়ে উঠছে।
- আমরা আমাদের বাগানে বা ঘরের ছাদে কিছু ফুলের গাছ রোপন করে সেগুলো যত্ন করতে পারি; আর সম্ভব হলে কিছু সব্জী এমনকি অন্যান্য কিছু গাছের চারা রোপন করে যত্ন নিতে পারি যার মাধ্যমে আমরা প্রকৃতির সেবা করার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে মানব সেবায় সময় দিতে পারব এবং সৃজনশীল ও সৃষ্টিশীল ঈশ্বরের উপস্থিতি উপলব্ধি করার সুযোগ পাব।

সুতরাং, আমরা যারা খ্রিস্টে বিশ্বাসী নর-নারী, আমাদের জন্য তপস্যাকালটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এটি আমাদের জীবনে আশীর্বাদ স্বরূপ। প্রার্থনা, ধ্যান, উপবাস, দান ও অন্যান্য ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমে আমরা যিশুর সাথে কালভেরী পর্বতে যাত্রা করি। সেই সাথে খ্রিস্টের পুনরুত্থানের মাধ্যমে আমাদের প্রত্যেকের জীবনে আসুক প্রকৃত ক্ষমা, আনন্দ, প্রেম এবং মুক্তি। যেন আমরা হয়ে উঠি খ্রিস্টের শক্তিশালী সাক্ষী; যেন আমরা অন্যদেরকেও খ্রিস্টের মুক্তি পেতে সাহায্য করতে পারি। যিশুর সাথে আমরা যে সন্ধিতে আবদ্ধ তা যেন চিরদিন অটুট থাকে॥

ঢাকাস্থ রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

(স্থাপিত : ২৫-১০-৯২, রেজিঃ নং-৭৯৪/২০০৭)

সূত্র নং : ঢা:রা:ধ:খ্রী:ব:স:স:লি:/সম্পাদক/২০২২/৬১ তারিখ : ২৩/০২/২০২২ খ্রিস্টাব্দ

২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা **"ঢাকাস্থ রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ"**-এর সম্মানিত সকল সদস্য-সদস্যাদের অবগতির জন্যে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১৭ মার্চ ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রোজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে ইয়ানতুন চাইনিজ এন্ড থাই রেষ্টুরেন্ট, ৫০ তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ এ সমিতির ২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় সমিতির সকল সদস্য-সদস্যাদের যথাসময় উপস্থিত হয়ে সভাকে সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

সভার স্থান : ইয়ানতুন চাইনিজ এন্ড থাই রেষ্টুরেন্ট
৫০, তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।
সভার তারিখ : ১৭ মার্চ, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
সভার সময় : সকাল ১০টা ৩০ মিনিট

ধন্যবাদান্তে -

জুয়েল প্রনয় রিবেরু
সম্পাদক
ঢাকাস্থ রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

বি:দ্র: সরকারি বিধি মোতাবেক স্বাস্থ্যবিধি মেনে ২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকতে হবে।

বিজ্ঞ/৬৪/২২

ভস্ম বুধবার ও ইস্টার সান্‌ডে গণনা পদ্ধতি প্রায়শ্চিত্তকালে করণীয়সমূহ

ফাদার কমল কোড়াইয়া

আর ক'দিন পরই আমরা ভস্ম বুধবারের মধ্যদিয়ে আমাদের প্রায়শ্চিত্তকাল শুরু করব। ২০২২ খ্রিস্টাব্দে ভস্ম বুধবার পড়েছে ২ মার্চ। ইস্টার সান্‌ডে হল ১৭ এপ্রিল। গত বছর ভস্ম বুধবার ছিল ১৭ ফেব্রুয়ারি। ইস্টার সান্‌ডে ছিল ৪ এপ্রিল। বুঝতেই পারছি, প্রতি বছর কিন্তু একই তারিখে ভস্ম বুধবারও পড়ে না, আবার ইস্টার সান্‌ডের তারিখও পরিবর্তন হয়। কেন এমনটি হয়? আমরা অনেকেই হয়তো বিষয়টি নিয়ে গোলক-ধাঁধায় আছি। জানতে চাই কিন্তু কোথায় উত্তর পাব তা আমাদের জানা নেই। অনেক সময় ছোটরা বড়দের কাছে সঠিক উত্তরটি জানতে চায় কিন্তু আমরা বড়রাতো আর উত্তর দিতে পারি না। বিব্রত হই। সঠিক উত্তরটি আর দেয়া হয় না। সবার জানার জন্যেই বিষয়টি নিয়ে আজকের এ আলোচনা।

১। ভস্ম বুধবার নির্ধারণ করার পূর্বে কিন্তু ইস্টার সান্‌ডের তারিখ ঠিক করতে হয়। আর চন্দ্রমাস হিসেব করেই প্রথমে ইস্টার সান্‌ডের তারিখ ঠিক করা হয়। আমরা অনেকেই জানি, ২১ মার্চ প্রতি বছর রাত ও দিন সমান। অর্থাৎ দিন বার ঘন্টা আর রাত বার ঘন্টা। ২১ মার্চের পরের পূর্ণিমার পর যে প্রথম রবিবার পড়ে তাই হল ইস্টার সান্‌ডে বা পুনরুত্থান বা পাস্কা পর্ব। ইস্টার সান্‌ডে থেকে পিছনের দিকে গুনেই নির্ধারণ করা হয় ভস্ম বুধবারের তারিখ। এ হিসেবে ইস্টার সান্‌ডে প্রতি বছর ২২ মার্চ ও ২৫ এপ্রিলের মধ্যে পড়বেই।

কাথলিক মণ্ডলীর প্রচলিত রীতি অনুযায়ী প্রায়শ্চিত্তকাল হল ৪০ দিনের। এ ৪০ দিন পূর্ণ করতেই আমরা সপ্তাহের মধ্যে পড়া ভস্ম বুধবার দিয়ে প্রায়শ্চিত্তকাল শুরু করি। এখানেও একটু বুঝবার আছে। গণনা করলে দেখা যাবে ভস্ম বুধবার থেকে পুণ্য শনিবার পর্যন্ত মোট ৪৬ দিন হয়। তবে কি আমাদের প্রায়শ্চিত্তকাল ৪৬ দিনের?

আসলে তা নয়। এ ৪৬ দিনের মধ্যে ৬টি রবিবার পড়ে। অর্থাৎ ৬ সপ্তাহ। রবিবার দিন হল প্রভুর দিন। আমরা প্রভুর দিনে খ্রিস্টযাগে যোগদান করি। বিশেষ প্রার্থনা করি। কাথলিক মণ্ডলীর রীতি ও শিক্ষা অনুসারে প্রায়শ্চিত্তকালের মধ্যে পড়া ৬টি রবিবার প্রায়শ্চিত্তকাল থেকে বাদ দেয়া হয়। ফলে আমরা প্রায়শ্চিত্তকাল পাই ৪০ দিন।

২। প্রায়শ্চিত্তকালের এ ৪০ দিনে আমাদের কাথলিক মণ্ডলীতে নির্দেশিত কিছু আবশ্যিক করণীয় আছে।

ক. উপবাস (অভুক্ত থাকা) ও মাংসাহার (মাছ-ডিম) ত্যাগ : কাথলিক মণ্ডলীর সর্বজনীন আইনের (Canon Law) ১২৫২ ধারা অনুসারে যাদের বয়স ১৮ থেকে ৫৯ বছরের মধ্যে এবং সুস্থ-সবল, ডাক্তারী কোন বাধা-নিষেধ নেই তারা ভস্ম বুধবার ও পুণ্য শুক্রবার উপবাস (অভুক্ত) থাকতে বাধ্য। বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী মাংস আহারের সাথে ডিম ও মাছ থেকেও এ দুই দিন বিরত থাকার জোর সুপারিশ করেছেন। অসুস্থদের জন্যে অবশ্যই ব্যতিক্রম আছে। তবে সাধ্য মত তাদেরও দিবস দুইটি ত্যাগ ও প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে অতিবাহিত করার পরামর্শ দেয়া হয়।

খ. শুধু মাংসাহার (মাছ-ডিম) ত্যাগ : যাদের বয়স ১৪ থেকে ৫৯ বছরের মধ্যে এবং সুস্থ-সবল, ডাক্তারী কোন বাধা-নিষেধ নেই প্রায়শ্চিত্তকালের প্রতি শুক্রবার তারা মাংসাহার পরিহার করতে বাধ্য। আর বাংলাদেশের কাথলিক বিশপ সম্মিলনী প্রায়শ্চিকালের প্রতি শুক্রবার ডিম ও মাছ উক্ত বয়সের বিশ্বাসীদের বিরত থাকার জোর আবেদন করেছেন।

গ. জাঁকজমক অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ : প্রায়শ্চিত্তকালে জাঁকজমক সামাজিক অনুষ্ঠান, আমোদপ্রমোদ নিষিদ্ধ। বিবাহসহ যে কোন জাঁকজমকপূর্ণ সামাজিক অনুষ্ঠান, বড় কোন ভোজসভা বা পার্টি আয়োজন প্রায়শ্চিত্তকালে নিষিদ্ধ। তবে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে অতি প্রয়োজনে সীমিত আকারে অনুষ্ঠান করা যেতে পারে। লক্ষ্য রাখতে হবে, তা কোনভাবেই যেন কেলেঙ্কারী বা অন্যের বিশ্বাস ও প্রচলিত রীতিনীতির অবমাননাকর না হয়।

৩। বাংলাদেশে উপবাসের প্রচলিত সাধারণ নিয়ম

ক) পূর্বের দিন সন্ধ্যা রাতে পূর্ণ আহার; সম্ভব হলে সকালে কোন কিছুই আহার না করা। দুপুরে পূর্ণ আহার করা। কোন কোন অঞ্চলে পূর্বের রাতে পূর্ণ আহার, সকালে কোন কিছুই আহার না করা: দুপুরে অর্ধাহার ও রাতে পূর্ণ আহার করা। দেশ ও অঞ্চল ভেদে উপবাস রীতির কিছুটা ভিন্নতা দেখা যায়।

খ) উপবাস থাকার মূল চেতনা হল খাবার গ্রহণ থেকে বিরত থেকে স্বেচ্ছায় শারীরিক কষ্ট অনুভব করা ও অভাবী-ক্ষুধার্তদের কষ্ট-যন্ত্রণা নিজেদের জীবনে অভিজ্ঞতা করা। নিজের ও অন্যের পাপের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করা। তাই বলা যেতে পারে, উপবাস শুধু কোন কিছু ছাড়া বা ত্যাগ করা নয় বরং আরও মহৎ কিছু পাবার বা অর্জন করার সুন্দর উপায় বা পদ্ধতি।

গ) উপবাস বা মাংসাহার ত্যাগ বা ত্যাগস্বীকার করে আমরা যে টাকা-পয়সা বা অতিরিক্ত খাবার (চাল-ডাল-সব্‌জি) সঞ্চয় করি তা আমরা কি করব? আমরা কি তা ঘরে রেখে আমরাই ব্যবহার করব? প্রকৃত অর্থে আমাদের তা করার কথা নয়। আমাদের প্রায়শ্চিত্তের সঞ্চয় আমাদের নিজেদের ভোগ করা সঠিক নয়। আমাদের উচিৎ তা গরীব-দুঃখীদের মধ্যে দান করে দেয়া বা গির্জায় তা দান করা। আমাদের ব্যবহারের অতিরিক্ত যা অন্যকে দিয়ে দিলে আমার বা আমাদের পরিবারের কোন কষ্ট হবে না বা অভাব অনুভব করব না, তা কিন্তু প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত নয়। প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত হবে যদি আমি বা আমরা আমাদের প্রয়োজন বা ব্যবহারের কোন কিছু অন্যের সাথে সহভাগিতা করি যার ফলে আমার মধ্যে অভাব অনুভূত হবে। যা ত্যাগ বা দানের ফলে আমি বা আমরা কষ্ট পাব।

ঘ) উপবাস প্রসঙ্গে, বর্তমানের অনেকের মুখেই আক্ষেপের স্বরে বলতে শোনা যায়- বর্তমান যুগে উপবাস বলতে আর কিছু নেই। মাত্র ভস্ম বুধবার আর পুণ্য শুক্রবার। আগেতো আমরা পুরো ৪০ দিনই উপবাস থাকতাম। কিছুই খেতাম না। আর বর্তমানের তার কিছুই নেই। আর মানুষও তাই ধর্ম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। বিষয়টি কিন্তু তেমনটি নয়। বাস্তবতায় কিন্তু বর্তমানে পূর্বের চেয়ে উপবাস আর প্রায়শ্চিত্তকাল উভয়ই আরও বেড়েছে এবং কঠিনও হয়েছে। বর্তমানে মাতা মণ্ডলী শিক্ষা দিচ্ছে- আমরা যারা বিশ্বাসে পরিপক্ক ও ঈশ্বরকে ভালবাসি তারা বছরে শুধু ২ দিন নয়। ঈশ্বরকে ভালবাসার কারণে বছরে সাধ্যমত যত দিন সম্ভব ততোদিনই যেন আমরা উপবাস থাকি। প্রায়শ্চিত্ত করি। আমাদের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে দুই দিন (ভস্ম বুধবার ও পুণ্য শুক্রবার) রাখা হয়েছে। বাংলাদেশে অনেক পরিবারে প্রতি সপ্তাহেই নিয়ম করে মাছ-মাংস-ডিম আহার ত্যাগ করে নিরামিষ খাবার রীতি পরিলক্ষিত হয়। এমন কি নির্ধারিত বয়স (১৮-৫৯ বছর) কম বা বেশী বয়সের অনেকেই নিয়মিত উপবাস থাকেন। নিরামিষ ভোজন করে থাকেন।

তাই বলা যায়, বর্তমানে উপবাস থাকা বা নিরামিষ ভোজনের নিয়ম কোন নির্দিষ্ট একটি সময় বা কালে সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি। গোটা বছরই উপবাস থাকা বা নিরামিষ ভোজনের সুযোগ রয়েছে। সুযোগ-সুবিধা অনুসারে স্বাধীনভাবে নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও অন্যের মঙ্গল-কল্যাণ কামনা করে বছরের যে কোন সময়ই উপবাস থাকা বা নিরামিষ ভোজন করা যেতে পারে।

প্রায়শ্চিত্তকাল হল তাই আমাদের জন্যে পুণ্য অর্জনের; ত্যাগস্বীকার করে গরীব-দুঃখী ভাইবোনদের সাথে সহভাগিতার; কষ্টভোগী সেবক যিশুর ক্রুশের সাথে আলিঙ্গন করার সর্বশ্রেষ্ঠ সময়॥

তপস্যাকালীন অনুচিন্তন: নিজেকে জয় করা

ফাদার বিপ্লব রিচার্ড বিশ্বাস

একবার দার্শনিক সক্রেটিসের একজন শিষ্য তাঁকে হঠাৎ করে প্রশ্ন করে বসলেন, "গুরু, একজন মানুষের পক্ষে কি নিজেকে জয় করা সম্ভব? নিজের একজন প্রিয় শিষ্যের কাছ থেকে আচমকা এমনতর প্রশ্ন শুনে মহাজ্ঞানী সক্রেটিস একটুখানি নীরব হয়ে ভাবতে লাগলেন; কি উত্তর দেবেন তিনি! কিছুক্ষণ পর নীরবতা কাটিয়ে ওঠে তিনি শিষ্যটিকে হাসি মুখে বললেন, "শোন, নিজেকে জানা সত্যিই কঠিন! তবে আরো কঠিন নিজেকে জয় করা"! তবে এটা ঠিক, কেউ যদি নিজের 'মন'কে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, কেবলমাত্র তার পক্ষেই নিজেকে পুরোপুরি জয় করা সম্ভব; সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র নিজেকে কেন গোটা পৃথিবীটাকে জয় করা সম্ভব"। শিষ্যটি তার গুরুর কাছ থেকে এমনতর উত্তর শুনে অবাক বিস্ময়ে অপলক দৃষ্টিতে তার গুরুর মুখপানে চেয়ে রইলেন।

আমরা জানি যে, প্রত্যেক মানুষের জীবনে পাঁচটি মহাশক্তিশালী কালো ঘোড়া (পঞ্চ ইন্দ্রিয়) আছে। এগুলো হলো আমাদের চোখ, কান, নাক, জিভ ও ত্বক। চোখ সর্বদা সবকিছু দেখতে চায়, কান সর্বদা সবকিছু শুনতে চায়, নাক সর্বদা সবকিছুর গন্ধ নিতে চায়, জিভ কথা বলতে চায় ও সর্বদা সবকিছুর স্বাদ নিতে চায় এবং ত্বক সর্বদা সবকিছুর স্পর্শ পেতে চায়। বলা যায়, এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়গুলোই সব সময় আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালিত করে। অন্যদিকে এই ঘোড়ারূপি পঞ্চ ইন্দ্রিয় গুলোকে নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব আমাদের মনের উপরই অর্পিত। আমাদের মন সে দায়িত্ব বিশ্বস্তভাবে পালন করতে চাবুক হাতে লাগাম ধরে বসে থাকলেও অনেক সময় ঘোড়ারূপি এই মহাশক্তিশালী পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কাছে আমাদের মন পরাজিত হয়, হার মানে বা বশ্যতা স্বীকার করে, ফলে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের মন পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের ক্রীতদাস হয়ে যায়। ফলশ্রুতিতে পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করতে আমরা ইন্দ্রিয় সুখের পেছনে ছুটে মরি। আর এভাবেই আমাদের জীবনে নেমে আসে বিনাশ বা ধ্বংস। এক্ষেত্রে আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তিক শক্তি যদি তীক্ষ্ম হয়, আমাদের মনোবল যদি শক্তিশালী হয়, আমাদের বিবেক যদি সৎ, স্বচ্ছ বা পরিষ্কার হয় তাহলেই কেবলমাত্র মনের হাতে থাকা চাবুকের জোরে ঘোড়ারূপি পঞ্চ ইন্দ্রিয় শক্তির লাগাম টেনে ধরা সম্ভব হয়। আর তখনই আমাদের 'মন' ঘোড়ারূপি মহাশক্তিশালী পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের উপর চেপে পেখম মেলে ছুটে বেড়ালেও চোখ সর্বদা ভালকিছু দেখবে, কান সর্বদা ভালকিছু শুনবে, নাক সর্বদা ভালকিছুর গন্ধ নিবে, জিভ সর্বদা ভাল কথা বলবে ও ভালকিছুর স্বাদ নিবে এবং ত্বক সর্বদা ভালকিছুর স্পর্শ পেতে চাইবে। আর তখনই কেবলমাত্র সক্রেটিসের কথানুসারে নিজেকে জয় করা সম্ভব হবে; এমনকি গোটা পৃথিবীটাকে জয় করা সম্ভব হবে।

সে যাই হোক, তপস্যাকাল বা প্রায়শ্চিত্তকাল হলো খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের যাত্রাপথে একটি বিশেষ সময় যখন আমরা নিজ ললাটে বা কপালে ভস্ম বা ছাই লেপনের মধ্যদিয়ে চল্লিশ দিন ব্যাপি অবিরাম প্রার্থনা, উপবাস ও আত্মত্যাগ বা ভিক্ষাদানের মধ্যদিয়ে নিজের নিজের জীবনের যে সকল কু-কর্ম, কু-প্রবৃত্তি, কু-অভ্যাস, কু-অভিলাষ, কু-বাসনা, কু-কামনা, কু-ভাবনা, কু-ইচ্ছা, কু-আসক্তি, পাপ-প্রবণতা, লোভ-লালসা, ভোগ-বিলাসিতা, কামনা-বাসনা ও ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা আছে তা ত্যাগ করে নিজেকে জয় করার সাধনা করি।

আর তাই এই তপস্যা বা প্রায়শ্চিত্তকালে আমাদের প্রত্যেককে অবিরাম প্রার্থনা, উপবাস ও ভিক্ষাদান আত্মত্যাগ করতে বলা হয়। কারণ প্রথমত–প্রার্থনা হলো এমন একটা আধ্যাত্মিক শক্তি যার মধ্যদিয়ে আমরা সকল মন্দ শক্তিকে, মন্দ অভ্যাসকে, মন্দ আসক্তিকে, নানা রকম পরীক্ষা ও প্রলোভনকে জয় করতে পারি। তাছাড়া ব্যক্তিগত প্রার্থনা আমাদের ঈশ্বরের সাথে, পারিবারিক প্রার্থনা পরিবারের সবার সাথে এবং সমবেত প্রার্থনা সকল মানুষের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে সাহায্য করে। দ্বিতীয়ত–উপবাস অর্থ খাবার থেকে মূলত বিরত থাকা। আর এটা আধ্যাত্মিক শুচিতা ও শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য খুবই গুরুত্বর্পূণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু প্রকৃত উপবাস মূলত তখন হয় যখন নিজেদের জীবনের খারাপ বা মন্দ অভ্যাস, বিভিন্ন মন্দ আসক্তি, বিভিন্ন পাপকার্য থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারি, যেমন–মন্দ কিছু দেখা থেকে বিরত থাকা, মন্দ কিছু শোনা থেকে বিরত থাকা, মন্দ কিছু চিন্তা করা থেকে বিরত থাকা, মন্দ কিছু বলা বা অন্যের সমালোচনা করা থেকে বিরত থাকা, অতিমাত্রায় খাবার গ্রহণ থেকে বিরত থাকা, মন্দ স্থানে বা মন্দ পথে যাওয়া থেকে বিরত থাকা, মন্দ কিছু স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি। তৃতীয়ত– ভিক্ষাদানের অর্থ হলো অপরের জন্য কিছু ত্যাগস্বীকার করা, অন্যের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া, অন্যের দুঃখে পাশে থাকা, অন্যের কষ্টে সহমর্মী হওয়া, অন্যের জন্য কিছু সময় ব্যয় করা, অন্যের সমস্যায় সাড়া দেওয়া, অন্যের সাথে সহভাগিতা করা ইত্যাদি। আর তাই তপস্যা বা প্রায়শ্চিত্তকালে মাতামণ্ডলী আমাদের প্রত্যেককে আহ্বান ও উৎসাহিত করে নিজ নিজ সামর্থ অনুযায়ী অন্যের সাহায্যে এগিয়ে যেতে, অন্যের দুঃখে পাশে থাকতে, পরিবারকে বেশি সময় দিতে, অন্যকে নিয়ে ভাল চিন্তা করতে, অন্যের সমস্যায় সাড়া দিতে, অন্যের সাথে নিজের যা আছে তাই সহভাগিতা করতে। তবে এটা স্বীকার করতেই হবে মানুষের পক্ষে সব চাহিদা বা প্রয়োজন পূরণ করা সম্ভব নয়; সেক্ষেত্রে মাতামণ্ডলী আমাদের উৎসাহিত করে আর্থিক ভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করতে না পারলেও মানসিকভাবে পরস্পরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করতে। কিন্তু কেন মাতামণ্ডলী আমাদের অবিরাম প্রার্থনা, উপবাস ও ভিক্ষাদান করতে আহ্বান বা উৎসাহিত করে! আমার মনে হয় এর অন্যতম প্রধান কারণ, এই তিনটির মধ্যদিয়ে আমরা একদিকে নিজেকে জয় করতে সমর্থ বা সক্ষম হই, অন্যদিকে পরস্পরকে (প্রতিবেশি) এবং সর্বোপরি প্রেমময় ঈশ্বরকে জয় করতে সমর্থ বা সক্ষম হই।

তপস্যা বা প্রায়শ্চিত্তকালের এই বিশেষ সময়ে মাতামণ্ডলী আমাদের প্রতি পদে পদে স্মরণ করিয়ে দেয় 'ওহে মানব, স্মরণ কর! তুমি ধূলি মাত্র; ধূলিতেই আবার ফিরে যাবে।' অর্থাৎ মানব জীবন খুবই ক্ষণস্থায়ী বা নশ্বর; তাই ক্ষণস্থায়ী বা নশ্বর মানুষ হিসাবে আজ হোক বা কাল হোক কিংবা দু'বছর পরে হোক আমাদের প্রত্যেককেই মৃত্যুর অমৃতময় সুধা পান করতেই হবে। সুতরাং এ জীবনে ধন-সম্পদ, অর্থ-বিত্ত, মান-মর্যাদা, জীবন-যৌবন সবই মূল্যহীন। তাই মাতামণ্ডলী এই বিশেষ সময়ে আমাদের প্রত্যেককে আহ্বান করেন নিজের নিজের দুর্বলতা ও পাপময় স্বভাবের জন্য ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা যাচ্না করতে এবং জীবন পরিবর্তনের জন্য তাঁর শক্তি, সাহস ও মনোবল কামনা করতে।

আমাদের মনে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগতে পারে পৃথিবীতে এত কিছু থাকতে, কেন আমাদের ললাটে বা কপালে সাধারণ ভস্ম বা

ছাই লেপনের মধ্যদিয়ে তপস্যা বা প্রায়শ্চিত্তকাল শুরু করি? কারণ ভস্ম হলো একটা চিহ্ন বা প্রতীক, আর খ্রিস্টমণ্ডলী সব সময় উপাসনায় বিভিন্ন ধরণের প্রতীক বা চিহ্ন ব্যবহার করে থাকে। ভস্ম বা ছাই প্রকাশ করে নশ্বর মানব এই ধূলা থেকেই জন্ম নিয়েছে, আবার এই ধূলাতেই সে মিশে যাবে। অর্থাৎ ভস্ম বা ছাই আমাদের মানব জীবনের ক্ষণস্থায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অন্যদিকে, মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং বাইবেলীয় শিক্ষায় ভস্ম বা ছাই হচ্ছে পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত, অনুতাপ, দুঃখ, অনুশোচনা, মন-পরিবর্তন, মন্দতা থেকে রক্ষা ও জীবনকে শুচি-শুদ্ধিকরণের বাহ্যিক প্রকাশ।

আমরা যদি গভীরভাবে লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাই, মানব জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভস্ম বা ছাইয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। ছাই মানব জীবনে বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যথা- থালা, বাসন (ধাতব দ্রব্য) পরিস্কারের জন্য ব্যবহৃত হয়; পোকামাকড় থেকে ফসল ও ফসলী জমিকে রক্ষা করার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়; কোন কিছুকে শক্ত করে ধরার জন্য হাতে ছাই মেখে নেওয়া হয়। অন্যদিকে আমরা যদি পবিত্র বাইবেলের দিকে দৃষ্টি দিই তাহলে দেখি– প্রবক্তা যোনার সতর্কবাণী শোনার পর নিনিভে শহরের রাজা ও অন্যান্যরা পরমেশ্বরে বিশ্বাস করেছিলেন, ফলে তারা পাপের অনুতাপ ও অনুশোচনা হিসাবে উপবাস করেছিলেন ও ভস্মের উপর বসে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন *(যোনা ৩:৫-৬)*; বিধবা ও ভক্ত নারী যুদিথ তার দেশবাসীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ মাথায় ভস্ম বা ছাই মেখেছিলেন *(যুদিথ ৯:১)*; মোশী ও আরোনের পরমেশ্বর যাজক এলেয়াজারকে নির্দেশ দিয়েছিলেন জনগণের শুদ্ধিকরণার্থে ভস্ম মিশ্রিত জল ছিটিয়ে দিতে।

আমরা জানি, প্রেমময় পরমেশ্বর পরম দয়ালু ও করুণাময়, আর তাই তিনি কখনোই চান নি তাঁর হাতে ও তাঁরই নিজের সাদৃশ্যে বা প্রতিমূর্তিতে গড়া মানুষ পাপের দাসত্বে পরিণত হয় কিংবা পাপের কাছে পরাজিত হয়। তাই তিনি বারবার তাদের রক্ষার জন্য, মন পরিবর্তনের জন্য, পাপের পথ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রবক্তাকে পাঠিয়েছিলেন এবং তাঁরাও বিশ্বস্তভাবে এবং ঈশ্বরের বাধ্য থেকে প্রেমময় ঈশ্বরের ইচ্ছার কথা তাদের কাছে তুলে ধরেছিলেন। তাই আমরা পবিত্র বাইবেলে দেখতে পাই, প্রবক্তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিভিন্ন সময় ইস্রায়েল জাতির মানুষ তাদের পাপের জন্য দুঃখ করেছেন, অনুতাপ করেছেন, অনুশোচনা করেছেন, চোখের জল ফেলেছেন; এমনকি শরীরে চটের কাপড় পড়েছেন ও ছাই মেখেছেন। ফলশ্রুতিতে প্রেমময় ঈশ্বরের ক্ষমা পেয়ে নবজন্ম লাভ করেছেন ও পুনরায় তাঁর সন্তান হবার অধিকার ফিরে পেয়েছেন। অর্থাৎ নিজেদের পাপের জন্য দুঃখ, অনুতাপ, অনুশোচনা করে একদিকে নিজেকে জয় করেছেন ও অন্যদিকে ঈশ্বরকে জয় করেছেন।

পবিত্র বাইবেলে চল্লিশ সংখ্যাটি অতিব গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ। বলা যায়, এটি একটি পরিপূর্ণ সংখ্যা। ফলে এ সংখ্যাটি পবিত্র বাইবেলে বারবার ব্যবহার করা হয়েছে। আমরা পবিত্র বাইবেলে দেখতে পাই, চল্লিশ সংখ্যাটি কখনো আশীর্বাদ, আবার কখনো পাপকার্যের অভিশাপ বা শাস্তি হিসেবে দেখানো হয়েছে বা উল্লেখ করা হয়েছে - জল-প্লাবনের সময় নোয়া চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত জাহাজের মধ্যে ছিলেন *(আদিপুস্তক ৬:১-৭:২২)*। মোশী এবার মেঘের মধ্যে ঢুকে পর্বতের ওপরে ওঠতে লাগলেন। তিনি একটানা চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত ধরে পর্বতের উপরে থাকলেন *(যাত্রাপুস্তক ২৪:১৮)*; ইস্রায়েল জাতি ভগবানকে ভুলে বাছুরের মূর্তি বানিয়ে পূজা করেছিলেন আর সেই কারণে মোশী জনগণের পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত ধরে রুটিও খাননি, জলও পান করেননি *(দ্বিতীয় বিবরণ ৯:১৮)*; ইস্রায়েল সন্তানেরা প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, আবার তেমন কাজ করতে শুরু করল। তাই ভগবান চল্লিশ বছরের জন্যে ফিলিস্টিনদের হাতে তাদের তুলে দিলেন *(বিচারকচরিত ১৩:১)*; রাজা দাউদ ত্রিশ বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করেন এবং চল্লিশ বছর ধরেই রাজত্ব করেন *(২ সামুয়েল ৫:৪)*; এলিয় চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত হেঁটে হোরেব পর্বতে গিয়ে ঈশ্বরের শরণ নিলেন *(১ রাজাবলি ১৯:৮)*; যোনা নিনিভেবাসীদের মন পরিবর্তনের জন্য তাদের কাছে ঘোষণা করেন চল্লিশ দিন পর নিনিভে উৎপাটিত হবে *(যোনা (৩:৪)*; এমনকি আমরা আমাদের প্রভু যিশুখ্রিস্টের জীবনে দেখেছি, তিনি দীক্ষাগুরু যোহনের হাতে যর্দন নদীর জলে দীক্ষিত হবার পরে মরুপ্রান্তরে চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত প্রার্থনা ও উপবাস করেছেন, শেষে শয়তান দ্বারা পরীক্ষিত ও প্রলোভিত হলেও তিনি তাঁর বিশ্বাস, ধৈর্য্য, অসীম সাহস, মনোবল ও বিচক্ষণতা দ্বারা সাপ রূপী শয়তানের তিনটি পরীক্ষায় পাস বা প্রলোভন জয় করেছেন *(মথি ৩:১৩-৪:১১)*। শুধু তাই নয়, তিনি পিতার একান্ত বাধ্য থেকে শাস্ত্রী-ফরিসি-সাদুকিদের দ্বারা অপমানিত হয়েছেন, নির্যাতিত হয়েছেন, ক্রুশের সীমাহীন যন্ত্রণা ভোগ করেছেন, ক্রুশ কাঁধে নিয়ে কালভারীতে গমন করেছেন, ক্রুশের উপর মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করেছেন, তিন দিন কবরে থেকেছেন এবং শেষে মৃত্যুশক্তিকে পরাজিত করে মৃত্যুঞ্জয়ী হয়েছেন। সুতরাং আমরাও যদি খ্রিস্টের পদাঙ্ক অনুসরণ করে মাতা-মণ্ডলীর দেওয়া এই চল্লিশ দিন প্রকৃত অর্থে, একাগ্র চিত্তে ও বিশ্বস্তভাবে অবিরাম প্রার্থনা, উপবাস ও ভিক্ষাদান বা ত্যাগ-স্বীকারের মধ্যদিয়ে আমাদের জীবনের সকল কু-কর্ম, কু-প্রবৃত্তি, কু-অভ্যাস, কু-অভিলাষ, কু-বাসনা, কু-ভাবনা, কু-ইচ্ছা, কু-আসক্তি, পাপ-প্রবণতা, লোভ-লালসা, ভোগ-বিলাসিতা, কামনা-বাসনা ও ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা আছে তা ত্যাগ করে নিজেকে জয় করতে পারি তাহলে এই চল্লিশ দিনের তপস্যা বা প্রায়শ্চিত্তকাল শেষে আমাদের জীবনে দেখতে পাবো মৃত্যুঞ্জয়ী খ্রিস্টের পুনরুত্থানের প্রকৃত সুখ, আনন্দ ও শান্তি।

পরিশেষে, তপস্যা বা প্রায়শ্চিত্তকালের এই চল্লিশ দিনের বিশেষ, গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যময় সময়ে আমাদের নিজ নিজ জীবন নিয়ে একটু নীরব হয়ে গভীর ভাবে চিন্তা ও অনুধ্যান করি এবং খুঁজে বের করতে চেষ্টা করি, নিজেকে জয় করতে হলে আমাকে, তোমাকে, আপনাকে কি করতে হবে? হতে পারে নিজেকে জয় করার জন্য যিশুখ্রিস্ট এই তপস্যাকালে এই কথা বলছেন, "যদি পূর্ণতা লাভ করতে চাও, তাহলে এখন যাও; তোমার যা কিছু আছে, সবই বিক্রি করে দাও; আর সেই টাকাটা গরীবদেরই দিয়ে দাও" *(মথি ১৯:২১)*! এখন বড় প্রশ্ন হলো আমি, তুমি, আপনি কি যিশুর দেওয়া এই চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে ধনী যুবকের মত বিষন্নভাব দেখিয়ে কিংবা নিরাশ হয়ে বাড়ি ফিরে যাব, "এই কথা শুনে যুবকটি কেমন যেন বিষন্ন হয়েই ফিরে গেল; কেন না তার নিজের প্রচুর সম্পত্তি ছিল" *(মথি ১৯:২২)*! নাকি নিজেকে, প্রতিবেশিকে এবং ঈশ্বরকে জয় করার জন্য কোন কিছু না ভেবেই সাধু পিতরের মত নির্দ্বিধায় ও নিঃসংকোচে বলতে পারবো, "আমরা আর কার কাছেই বা যাব, প্রভু? শাশ্বত জীবনের বাণী তো আপনার কাছেই রয়েছে" *(যোহন ৬:৬৮)*।

তাই আসুন, এই তপস্যা বা প্রায়শ্চিত্তকালের বিশেষ সময়ে আমাদের প্রত্যেকের সাধনা হোক নিজের নিজের জীবনের সকল কু-কর্ম, কু-প্রবৃত্তি, কু-অভ্যাস, কু-অভিলাষ, কু-কামনা, কু-বাসনা, কু-ভাবনা, কু-ইচ্ছা, কু-আসক্তি, পাপ-প্রবণতা, লোভ-লালসা, ভোগ-বিলাসিতা, কামনা-বাসনা ও ব্যক্তিকেন্দ্রিকতাকে পরাজিত করে নিজেকে, প্রতিবেশিকে ও ঈশ্বরকে জয় করা। প্রেমময় পরমেশ্বর আমাদের প্রত্যেককে সেই চেতনা, প্রেরণা, শক্তি, সাহস ও মনোবল দান করুন॥ ৯০

ভস্ম থেকে ভস্মবুধবার অতঃপর প্রায়শ্চিত্তকাল

সাগর কোড়াইয়া

ছাইকে আমরা অবহেলার বস্তু হিসাবেই জানি। কথার ফাঁকে কারো ওপর বিরক্ত হলে বলি 'দূর ছাই'। অর্থাৎ ছাই যেমন অবহেলা বা বিরক্তিজনক বস্তু তেমনি ব্যক্তিটিও ছাইয়ের সমতুল্য। ছাইকে আমরা যতই অবহেলা করি না কেন ছাই নানাবিধ কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ছাইয়ের নানাবিধ গুণাগুণ রয়েছে। শহরাঞ্চলগুলোতে ছাই বিক্রিও করা হয়। ঢাকাতে থাকাকালীন এক বাসায় গিয়েছি। বাসায় বসে থেকেই শুনতে পেলাম ছাই বিক্রেতা মহিলা অভিনব সুরে চিৎকার করে ছাই বিক্রি করছে। আমার ধারণা ছিলো না যে, ছাইও বিক্রি হয়। কৌতুহলবশত জানালার ফাঁক গলে উঁকি দিলাম। মধ্যবয়স্ক একজন মহিলা প্লাস্টিকের বস্তায় ছাই ভরে মাথায় নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। অনেককে আবার ছাই কিনতেও দেখলাম।

যাই হোক- গ্রামাঞ্চলের প্রেক্ষিতে প্রতিদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই মায়েদের প্রথম কাজই হলো চুলার ছাই তোলা। ছাই উপকারী পদার্থ হলেও তা সংগ্রহের যে উপকরণ তা আবার ভাঙ্গা কোন মাটির পাতিলের অংশবিশেষ হয়ে থাকে। অন্যদিকে ছাই আবার ফেলা হয় বাড়ির বাহিরে অবহেলিত কোন স্থানে। ছাই এত অবহেলার হলেও এমন কিছু বিশেষ কাজে ছাই ব্যবহৃত হয় যা অন্য কিছু দিয়ে সম্ভব হয় না। বিশেষভাবে ছাই দিয়ে দাঁত, হাঁড়ি-পাতিল মাজা হয়। জমিতে ছাই ব্যবহার করে জমির উর্বরতা বাড়ানো ও জমিতে কীটনাশক হিসাবে ছাইয়ের ব্যবহার একটি প্রাচীন কৃষি-চিকিৎসা ব্যবস্থা। মাছ কুটতে ছাইয়ের ব্যবহারের জুড়ি মেলা ভার। ভেজা, স্যাঁতস্যাঁতে মাটিতে ছাই ব্যবহার করে শুষ্কতা আনা হয়। এগুলো ছাড়াও ছাই হয়তো আরো নানাভাবে ব্যবহৃত হয়।

সপ্তাহে বুধবার একবার আসে। আর বছর হিসাব করলে অসংখ্য বুধবার পঞ্জিকাতে ঠাঁই করে নিয়েছে। তবে মণ্ডলীতে ভস্মবুধবার বছরে একবারই আসে। মণ্ডলীতে ভস্মবুধবার ভস্ম লেপনের মধ্যদিয়ে প্রায়শ্চিত্তকালে প্রবেশের রীতি প্রচলিত। তবে ভস্ম মাখানোর ইতিহাস বেশী পুরাতন নয়। একাদশ শতাব্দিতে ভস্মবুধবারে ছাই লেপনের রীতি চালু হয়। বাইবেলের পুরাতন নিয়মে ভস্ম শরীরে মেখে উপবাস বা ত্যাগস্বীকার করার উদাহরণ রয়েছে। প্রবক্তা দানিয়েলের পুস্তকের নবম অধ্যায়ে ছাই মেখে উপবাস করার কথা বলা হয়েছে। তাই বলা যায় ছাই লেপন হচ্ছে প্রায়শ্চিত্তের চিহ্ন। ভস্মবুধবারে ছাই লেপনের সাথে সাথে উচ্চারিত বাক্য "হে মানব, মনে রেখো তুমি ধুলি আর ধুলিতেই মিশে যাবে" মর্ত্যের মানুষকে জন্ম ও মৃত্যুর পরের পরিণাম সম্বন্ধে সচেতন করে দেয়।

বিশ্বের বৃহৎ ধর্মগুলোর প্রবর্তক, মুণি-ঋষিগণ মহৎকাজে প্রবেশের পূর্বে প্রায়শ্চিত্ত ও উপবাস করে নিজেকে প্রস্তুত করেছেন। যিশুখ্রিস্ট তাঁর প্রচার কাজ আরম্ভের পূর্বে মরুভূমিতে ৪০ দিন উপবাস করেছেন। মরুভূমির বাস্তবতা হলো- যেদিকেই চোখ যায় শুধু বালি আর বালি। তাই এই ৪০ দিনের উপবাসে যিশুর শরীর ভস্মের পরিবর্তে নিশ্চয়ই বালিতে ভরপুর হয়ে গিয়েছিলো। অনেক সাধু-সাধ্বীদের মধ্যে উপবাস করার রীতি প্রচলিত ছিলো। যিশুর যন্ত্রণা, মৃত্যু ও পুনরুত্থান রহস্যে প্রবেশের পূর্বে খ্রিস্টভক্তদেরও উপবাসের মধ্যদিয়ে চল্লিশ দিন অতিবাহিত করতে হয়। তাই উপবাস দেখানোর কোন বিষয় নয় "তোমরা যখন উপবাস কর, তখন ভণ্ডদের মতো বিষন্ন ভাব দেখিয়ো না" *(মথি ৬:১৬)*। বরং উপবাস হচ্ছে নিজের খারাপ কিছু পরিত্যাগ করে ভালোর সাথে সন্ধি স্থাপন। তবে ব্যক্তিবিশেষে উপবাস ভিন্ন ধরণের হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। উপবাস এমনই হওয়া উচিৎ যা উপবাসের পর মানুষকে নতুন জীবন দান করে। আবার এমনও লোক দেখা যায়, যিনি উপবাস অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন ঠিকই কিন্তু জীবনের রূপান্তর ঘটে না।

তপস্যাকাল মানুষকে নিজের মধ্যে প্রবেশ করে আত্মশুদ্ধিক্রিয়া সম্পন্ন করতে পথ দেখায়। যে তিনটি কাজ মানুষের জন্য কঠিন সেই তিনটি কাজ উপবাস, প্রার্থনা ও দয়াদানে মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধিক্রিয়া সম্পন্ন করতে মাতামণ্ডলী খ্রিস্টভক্তদের অনুপ্রাণিত করে। মানুষ স্বাভাবিকভাবে খাদ্যের প্রতি দুর্বল তাই সীমিত আহার অর্থাৎ উপবাস, প্রার্থনায় অমনোযোগিতা পরিহার করে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে প্রার্থনায় মনোনিবেশ ও দয়াদান বা দয়াভিক্ষা যা অন্যকে দেবার ফলে নিজের কষ্ট হবে জেনেও নিস্বার্থভাবে দেওয়াই হয়ে ওঠতে পারে তপস্যাকালের স্বার্থকতা। তপস্যাকালের এই তিনটি শুদ্ধিক্রিয়া মানুষকে আধ্যাত্মিকভাবে পূর্ণতা লাভে সহায়তা করে। তবে উপবাস আধ্যাত্মিক ও দৈহিক উভয়ে সুস্থতায় অপরিহার্য। উপবাস মানুষকে সংযম শেখায়। তাই উপবাস আমাদের জন্য একটি বড় পাওয়া। কিন্তু অনেক সময় আমরা উপবাস শুধুমাত্র আহার গ্রহণ থেকে বিরত রাখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখি। উপবাস যে আরো অনেকভাবে হতে পারে তা হয়তো উপলব্ধিতে আনি না।

ভস্ম থেকে ভস্মবুধবারের আধ্যাত্মিকতা আসে। আর ভস্মবুধবারের মধ্যদিয়ে প্রায়শ্চিত্তকালের পূর্ণতা পায়। সাধারণ একটি দিন কিভাবে কপালে ভস্মের স্পর্শে অসাধারণ হয়ে ওঠতে পারে তা ভস্মবুধবারেই স্পষ্ট হয়। যে ভস্ম তুচ্ছ হিসাবে বিবেচ্য সে ভস্মই কপালে স্পর্শ ও বাক্যে পবিত্র হয়ে ওঠে। ভস্ম লেপনের মাধ্যমে প্রায়শ্চিত্তকালে প্রবেশ করে নিজের

একুশের প্রেরণা

দাউদ জীবন দাশ

একুশ বলতে আমরা বুঝি বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের কথা। এ আন্দোলন ছিল বাঙালি জাতির গর্ব। কারণ পরবর্তী সময়ে ভাষা আন্দোলন এ জাতিকে অনুপ্রাণিত করেছে, সাহস যুগিয়েছে, ধাবিত করেছে বৃহত্তর অর্জন মুক্তি সংগ্রাম ও সার্বভৌম বাংলাদেশের দিকে। ভাষা আন্দোলনের অপরিসীম অবদানের কথা আমাদের জাতির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। আমাদের জাতিসত্তার বিকাশের মূলে নিহিত রয়েছে একুশের চেতনা। বাংলাভাষার আন্দোলন বাঙালি জাতি গঠনের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে এবং ভাষা আন্দোলনের পথ ধরেই আমাদের জাতি ধীরে-ধীরে অগ্রসর হয়েছে। যার ফসল আমাদের স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ।

একুশের আন্দোলন এক গৌরবের উপাখ্যান। এর প্রেরণা সৃষ্টির; ধ্বংসের নয়। এর প্রেরণা নিজস্ব সংস্কৃতি ও কৃষ্টির বিকাশের প্রেরণা। এর প্রেরণা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার প্রেরণা। সর্বোপরি একুশের প্রেরণা অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার প্রেরণা।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের একুশে ফেব্রুয়ারিতে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের দাবিতে আন্দোলন ও বিক্ষোভের চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটে। মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতিদানের জন্য আন্দোলনের সূত্রপাত হয় ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ভারত বিভক্তি এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের কিছু সময় পরেই সূচনা হয় এ আন্দোলনের। উর্দুকে নব প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেয়া ছিল সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। তৎকালীন পাকিস্তানে বাংলাভাষী মানুষ ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। অতএব সংখ্যাগরিষ্ঠ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগোষ্ঠীর উপর ভিন্ন একটি ভাষা চাপিয়ে দেয়া এ দেশের অগ্রসরমান তরুণ ছাত্রসমাজ মেনে নিতে পারেনি। বস্তুত বাংলাকেই রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দান তারা সমীচীন বলে মনে করে। তাই তারা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি তোলে। পাকিস্তান সৃষ্টির এক বছরের মধ্যেই তথা ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ক্রমান্বয়ে এই দাবি ব্যাপকতা লাভ করে।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এই সংগ্রামকে তীব্রতর করে এবং সে বছর একুশে ফেব্রুয়ারিতে তদানীন্তন সরকারের জারিকৃত ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ভাষার দাবিতে মিছিল বের করে। মিছিলে গুলিবর্ষণ করা হয়। বরকত, সালাম, জব্বারসহ অনেকে শহীদ হন। এই ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে এ অঞ্চলে বাংলা ভাষা ভিত্তিক একটি জাতীয় রাষ্ট্র উত্থানের বীজ বপন করা হয়। বস্তুতপক্ষে ভাষা আন্দোলন আমাদের জাতীয় জীবনে, আমাদের সকল কর্মকাণ্ডে, আন্দোলনে, সংগ্রামে, সর্বোপরি আমাদের মুক্তিযুদ্ধে অশেষ প্রেরণা যুগিয়েছে এবং ভবিষ্যতেও প্রেরণা যোগাবে। এটি একটি মহান আন্দোলন- যে আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছিল একটি জাতির ভাগ্য নির্ধারণের জন্য। ভাষা আন্দোলনের সাফল্য পরবর্তীকালে আমাদের জাতীয় জীবনে এক সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রেখেছিল।

সমগ্র পৃথিবীতে ভাষার জন্য কোনো জনগোষ্ঠীর আত্মত্যাগের এমন উদাহরণ সত্যিই বিরল। এ আন্দোলন শিক্ষা দেয় অধিকার আদায়ের সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হতে। এ আন্দোলন প্রেরণা যোগায় অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বিপ্লবের। এ আন্দোলন উৎসাহ যোগায় মাথা নত না করবার। একুশের চেতনা সাহস যুগিয়েছে এ জাতির স্বাধিকার আন্দোলনে; সাহস যুগিয়েছে অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামে; প্রেরণা যুগিয়েছে স্বাধীনতার আন্দোলনে; প্রেরণা দিয়েছে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম জাতির রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায়।

আমাদের জাতির সমসাময়িক কালের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে আমাদের যা কিছু মহান অর্জন তার পিছনে কাজ করেছে যে অদৃশ্য শক্তি তা ছিল একুশের চেতনা এবং একুশেরই অনুপ্রেরণা। ভাষা আন্দোলনের দু'বছর পরেই ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের জয়লাভ এবং মুসলিম লীগের পরাজয় একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। কারণ যে মুসলিম লীগ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল সেই মুসলিম লীগ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাত্র ছয়-সাত বছরের মধ্যেই শোচনীয় পরাজয় বরণ করে। এর প্রধান কারণ এ অঞ্চলের মানুষ মুসলিম লীগকে পাকিস্তানী শাসক এবং শোষক শ্রেণির এবং উর্দূ ভাষার স্বার্থ রক্ষাকারী হিসেবে চিহ্নিত করে। তাই তারা এর বিরোধী শক্তি যুক্তফ্রন্টকে সমর্থন দান করে। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটিও এখানে গুরুত্ব লাভ করে। ভাষা আন্দোলনের প্রেরণা এ নির্বাচনকে প্রভাবিত করে।

মূলত পাকিস্তানের শাসকচক্র তখন থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে বিমাতাসুলভ ব্যবহার শুরু করে। কেন্দ্রে কোয়ালিশন শাসক দলগুলোর চক্রান্তের কারণে পাকিস্তানে গণতন্ত্রের ভিত একেবারে নড়বড়ে হয়ে ওঠে। ঘন ঘন সরকার বদল এবং এর উত্থান-পতন ও স্বার্থান্বেষী দলগুলোর হানাহানির সুযোগ নিয়ে ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান জেনারেল আইয়ুব খান সারা দেশে সামরিক শাসন জারি করেন। তারপর ইস্কান্দার মীর্জাকে অপসারিত করে নিজেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতির পদ দখল করেন। সারা পাকিস্তানে কায়েম করেন স্বৈরতন্ত্র। তার দীর্ঘ দশ বছরের স্বৈরশাসনের মূল লক্ষ্য ছিল পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের অধিকার হরণ। ছলে বলে কৌশলে তিনি দমন নীতি চালু করেন এবং সকল ন্যায্য অধিকার থেকে এ অঞ্চলের মানুষকে বঞ্চিত করেন। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ লুণ্ঠন ও পাচার করে এক সমৃদ্ধশালী ও শক্তিশালী পশ্চিম পাকিস্তান গড়ে তোলাই ছিল আইয়ুব শাহীর মূল লক্ষ্য। আইয়ুব শাসনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম প্রতিবাদমুখর হয় পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ। প্রতিবাদ শুরু হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এ সহজেই অনুমেয় যে এই ছাত্রসমাজ ছিল ভাষা আন্দোলনের উত্তরসুরী। বাষট্টির শেষভাগে এই আন্দোলন তীব্রতর হয় এবং সমগ্র ষাটের দশকে এ আন্দোলন, সংগ্রামের বিস্তার ঘটে। আমরা মনে করি বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, যা গণ-আন্দোলনের রূপান্তরিত হয়, তারও মূলে ছিল একুশের প্রেরণা।

ষাটের দশকের বাংলা সাহিত্য ও সংগীতে তথা সংস্কৃতির বিকাশ ও চর্চাকে নিরুৎসাহিত করতে চেষ্টা চালানো হয়। স্বার্থান্বেষী শাসকচক্র বিকাশমান বাঙালি সংস্কৃতির উপর আঘাত হানে। এই সময় আমাদের সংস্কৃতি তথা বাঙালি সংস্কৃতির বিরুদ্ধেও চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র শুরু হয়। বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার পরিবর্তে আইয়ুব খান পাকিস্তানী সব ভাষার সমন্বয়ে 'লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্ক' উদ্ভাবনের প্রস্তাব দেয়ারও চেষ্টা করেন। এই ধরনের অদ্ভুত এবং আকস্মিক পরিকল্পনা এদেশের মানুষকে ব্যথিত করে। বাংলাদেশের মানুষের অতিপ্রিয় রবীন্দ্র সংগীত সে সময় নিষিদ্ধ করা হয়। আইয়ুবের এদেশের চাটুকার বুদ্ধিজীবীরা এতে সায় যোগায় এবং রবীন্দ্র সংগীতের বিরুদ্ধে স্বাক্ষর অভিযান পরিচালনা করেন। কিন্তু ফল হয় উল্টো। রবীন্দ্র সঙ্গীত মানুষের আরো প্রিয় হয়ে ওঠে। পাকিস্তানী শাসকদের ধারণা ছিল যে বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সঙ্গীত, সংস্কৃতি থেকে সরিয়ে আনতে পারলেই এদেশের বাঙালিকে খাঁটি পাকিস্তানী বানাতে পারবে। তাই ছিল এ ধরনের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। কিন্তু আসলে পাকিস্তানী আইয়ুব শাসকগোষ্ঠী ছিল অদূরদর্শী। বাঙালি সংস্কৃতির উপর আঘাত হানতে গিয়ে তারা একে করে দিল আরো গতিশীল। ভাষা এবং সংস্কৃতির আন্দোলন হলো আরো মজবুত ও বলিষ্ঠ। বলাবাহুল্য, এ আন্দোলনের মূলে ছিল একুশের চেতনা।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, একুশ আমাদের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও সংগ্রামে প্রেরণা যুগিয়েছে। এ কথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, ঊনসত্তরে গণঅভ্যুত্থান এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মূলে ছিল ভাষা আন্দোলনের শিক্ষা ও অনুপ্রেরণা। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে তদানীন্তন পূর্ব বাংলার বাঙালি জাতি শোষণ, নির্যাতন ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রামে লিপ্ত হয়। নয় মাসব্যাপী এ মুক্তিযুদ্ধে শ্রেণি বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে সকল বাঙালি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শরিক হয়। মুক্তি পাগল বাঙালি জাতি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ভীতু বাঙালি বীর বাঙালিতে পরিণত হয়। সশস্ত্র এই সংগ্রামে ত্রিশ লক্ষ বাঙালি জীবন বিসর্জন দেন। স্বাধীনতার জন্য এত বিশাল আত্মত্যাগের কাহিনী মানব ইতিহাসে বিরল। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ কিংবা ফরাসি বিপ্লবের চেয়েও আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ত্যাগ তিতিক্ষার আরো বড় উদাহরণ। এ আমাদের জাতির এক গৌরবময় উপাখ্যান- আমাদের জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন। মুক্তিযুদ্ধের সফলতা আমাদের আজকের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। সেজন্য আমরা বিশ্বাস করি, ভাষা আন্দোলনের চেতনা এবং অনুপ্রেরণাই আমাদের টেনে এনেছে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মুক্তি সংগ্রামে।

একাত্তর পরবর্তী স্বাধীন বাংলাদেশের ঘটনাপ্রবাহ প্রমাণ করে যে, একুশ এখনও এই জাতিকে প্রেরণা যুগিয়ে চলেছে। আমাদের বিভিন্ন অর্জনের ক্ষেত্রে এর প্রমাণ মেলে। অনেকে হয়তো মনে করেন শুধু আন্দোলন সংগ্রামের মধ্যেই একুশের চেতনা সীমাবদ্ধ কিন্তু তা নয়; একুশের চেতনা আরো অনেক ব্যাপক এবং বিস্তৃত। বস্তুতপক্ষে, একুশের চেতনা জাতীয় জীবনের প্রত্যেকটি সৃষ্টিশীল কাজের মধ্যে নিহিত রয়েছে। জাতীয় জীবনের প্রতিটি অর্জনকে এটি অনুপ্রাণিত করেছে। আমরা আশা করি যে, আমাদের সাহিত্যে, কাব্যে, সঙ্গীতে, চিত্রকলাসহ সংস্কৃতির বিভিন্ন অঙ্গে এর অনুপ্রেরণা আরো মূর্ত হয়ে ধরা দেবে এবং যুগ যুগ ধরে আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ চলার পথের পাথেয় হয়ে থাকবে। সর্বোপরি, ভাষা আন্দোলন তথা একুশের চিরঞ্জীব শহীদসহ স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার সাথে প্রত্যয়দৃপ্ত উচ্চারণে যুক্তিযুক্ত কারণেই আশাবাদ ব্যক্ত করা যায়, তাঁদের আত্মদানের অমলিন স্মৃতি, ত্যাগের মহিমা ও ঐতিহ্যকে সমুন্নত রেখে আমরা সবাই দেশের জন্য, জাতির জন্য ও মাতৃভাষার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাবো- এটাই আমাদের স্থির প্রতীতি ও প্রেরণা॥

একটি অপ্রকাশিত গল্প

(১৭ পৃষ্ঠার পর)

বিকেল হয়ে গেল। নূপুরের ধীরগতিতে হাঁটার জন্য ওরা দল থেকে পিছিয়ে গেল। এমন সময় অল্পপরিচিত একটা লোক এসে বলল, চলেন আপনাদের কাছাকাছি একটা বাড়ীতে নিয়ে যাই আশ্রয়ের জন্য। এরা আমার পরিচিত, আপনাদের সাহায্য করবে। নির্ঝরের বাবা কিছুটা দ্বিধান্বিত হলেও সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে ওই লোকটার সাথে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। গ্রামের ভিতর দিয়ে কিছুটা নির্জন পথ হাঁটার পর হঠাৎ করে আরও কয়েকজন লোক উপস্থিত হল। বুঝে ওঠার আগেই ওদের তিনজনের চোখ-মুখ বেঁধে ফেলল। শত চেষ্টা করেও কেউ কোন শব্দ করতে পারল না। শুধু শুনতে পেল কেউ একজন ব্যঙ্গ করে বলল, শালা, ছেলেকে যুদ্ধে পাঠাও? এবার বুঝো ঠ্যালা।

ওদেরকে হানাদার বাহিনীর ঘাঁটিতে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর আর কেউ ওদেরকে দেখেনি, কেউ কোন খোঁজ দিতে পারেনি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর নূপুরের বিজয়ী-দাদা ফিরে এসে আর কাউকে কোনদিন খুঁজে পায়নি। বর্বর, নৃশংস, নিষ্ঠুর, নির্মম পাকিস্তানী হানাদার-বাহিনী এবং রাজাকারদের কাছ থেকে ঈশ্বরও নির্ঝরের সন্তান এবং ভালবাসাকে রক্ষা করতে পারেনি॥

চির বিদায়ের দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী

"চলেই যদি যাবে
তবে তুমি এসেছিলে কেন? আমারই অন্তরে।"

প্রয়াত যোসেফ রিবেরু
জন্ম: ২ মার্চ, ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২ মার্চ, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: ভুরুলিয়া, নাগরী ধর্মপল্লী

আজ মরলে কাল দুই দিন! দেখতে-দেখতে দুইটি বছর ঘুরে ফিরে এলো দুঃখ ভারাক্রান্ত সেই দিন। জন্মদিনে আনন্দ না পেয়ে চিরকালের মতো তোমাকে হারিয়েছি। জন্মদিন স্মরণ করব না মৃত্যুবার্ষিকী? উত্তর দাও প্রিয়তম! এই দিনে আমরা শ্রদ্ধাভরে ও শোকার্ত চিত্তে সবসময় যেন তোমাকে স্মরণ করতে পারি। প্রতি সেকেন্ডে, প্রতি মুহূর্তে তোমার শূন্যতা আমাদের ভীষণ কষ্ট দিয়ে কাঁদাচ্ছে। তোমাকে ছাড়া আমরা কিভাবে দিন যাপন করছি তা কি তুমি বুঝনা? এবারে বড়দিনে তোমাকে ছাড়া উৎসব করতে হয়েছে কিন্তু আমরা তোমাকে হৃদয়ভরে স্মরণ করেছি।

প্রিয়তম তুমি ছিলে উদার, পরোপকারী, সমাজসেবক এবং দাতা। তোমার দেওয়া ভুরুলিয়া আর্জিনা শিশু শিক্ষালয় যেন আজীবন চলমান থাকে। তোমার আদর্শ অনুসরণ করে আমরা যেন পথ চলতে পারি। তোমার মৃত্যুর পর উপকারী বন্ধু-বান্ধবী, ফাদার, সিস্টার-ব্রাদারগণ, পাড়া-প্রতিবেশি এত লোক হয়েছিল এমন ভাগ্য ক'জনেরই বা হয়। তোমার মৃত্যুর পর যারা আমাদের পাশে ছিল ও আছে তাদের সকলের মঙ্গল কামনা করি। তোমার চলে যাওয়ার পর ফিরে এসেছে ছোট মেয়ের কোলে একটি সন্তান। তার নাম রাখা হয়েছে যোসেফ! তুমি অবশ্যই খুশী হয়েছো, তাইনা। পরম করুণাময় ঈশ্বর তোমার আত্মাকে চিরশান্তি দান করুন এ কামনায়।

শোকাহত পরিবার
মা: তেরেজা কোড়াইয়া
বড় বোন: মমতা রিবেরু
স্ত্রী: শিউলী হেলেন রিবেরু
বড় মেয়ে জামাই ও নাতী: কচমিতা-তরুন পালমা, বর্ষ আন্তনী পালমা
ছোট মেয়ে ও জামাই - নাতি-নাতনী: নন্দিতা রিবেরু, জয় পালমা (জয়তী ও যোসেফ জর্দান পালমা)
একমাত্র পুত্র: প্রয়াস মার্টিন রিবেরু, অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব।

বিজ্ঞ/৬৫/২২

মহান একুশের চেতনায় উদ্বুদ্ধ বাঙালি, ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি ও আমাদের সার্বিক দেশপ্রেম প্রসঙ্গে

এলড্রিক বিশ্বাস

বাংলাদেশে প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারি আসলেই মানুষের ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জানানোর ইচ্ছা আপনাআপনি চলে আসে। প্রতি বছর ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সাধারণ মানুষ ও রাজনৈতিক দলগুলোর শ্রদ্ধা নিবেদনের প্রতিযোগিতা হয়। বিশেষভাবে রাজনৈতিক দলগুলো কে কার আগে শ্রদ্ধা জানাবে তার প্রতিযোগিতা হয়। মারামারি যে হয় না তা নয় তবে শক্তির দৌড়ে যে রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় থাকে সেই দলের ছাত্র ও যুব সংগঠনের প্রভাব বেশী পরিলক্ষিত হয়। ১৯৭১ এর ১৬ ডিসেম্বরের পর থেকে ২০২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ও সেইসব রাজনৈতিক দলের ছাত্র ও যুব সংগঠনের উদ্যোগে শহীদ মিনার দখল নেয়া এবং প্রভাব বিস্তার সবই ছিল ও এখনও আছে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন, সংস্থা, পরিবার ও ব্যক্তি যারা স্ব-প্রণোদিত হয়ে শহীদ মিনারে রাতে বা ভোরে গিয়েছে তারা আমার এই লেখার বিষয়াটি ভালোভাবে উপলব্ধি করেছে।

'একুশ মানে মাথা নত না করা' কথা সাহিত্যিক আবুল ফজল এর এই উদ্বৃতিটি আমরা কতটুকু মনেপ্রাণে ধারণ করি। আমরা দেখতে পাই আমাদের চোখে, উপলব্ধিতে ও প্রতিবেশ, পরিবেশে উপরোক্ত কথার প্রায়োগিক দিক। অনেক সময় অন্যায় দেখলেও চুপ থাকি। এতে নিজে প্রতিবাদ না করলেও নীরবতা সম্মতির লক্ষণ হিসেবে প্রকাশ পায়। অন্যায়কারীরা এখন নিজে অন্যায়তো করে আবার তা সমর্থন করার জন্য সিন্ডিকেট নিয়ে প্রভাব বিস্তার করে বুক ফুলিয়ে চলে। অন্যায়কারীর উপলব্ধি থাকে তাকে রক্ষা করবে সিন্ডিকেট। তবে আমাদের আশা জাগানিয়া দিক হচ্ছে আমাদের যুবারা এখনও অন্যায়ের কাছে হারিয়ে যায়নি। সেই চেতনাবোধ যেন সর্বদা জাগ্রত থাকে।

একুশে ফেব্রুয়ারি আসলেই আমরা একুশের মাস হিসেবে ১ ফেব্রুয়ারি থেকে বাঙালি কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগী হয়ে উঠি। রেডিও, টেলিভিশনে অনুষ্ঠান, সংবাদপত্র (প্রিন্ট ও অনলাইন) এবং ফেইসবুকে লেখালেখি চলমান থাকে। আমাদের ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সমাজেও একুশ নিয়ে অনেক অনুষ্ঠান হয়। যেমন ২০ ফেব্রুয়ারি মধ্যরাতে বা ২১ ফেব্রুয়ারি ভোরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়ে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন। ঢাকায় স্বাধীনতা উত্তর পুরানো ঢাকার সুহৃদ সংঘ, খ্রীষ্টান ছাত্র কল্যাণ সংঘ, ঢাকা ক্রেডিট, ঢাকা ওয়াই এমসিএ, খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন, গারো স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (গাসু), বাগাসাস, সান্তাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন, বিসিএসএ ও কিছু সাংস্কৃতিক সংগঠন শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা জানায়। বিভিন্ন মিশনারী স্কুল তাদের স্কুলের শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা জনায়।

চট্টগ্রামে ১৯৭৯ এ প্রতিষ্ঠা লাভের পর ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রায় প্রতি বছর খ্রীষ্টিয়ান স্টুডেন্টস্ অর্গানাইজেশন (সিএসও) চট্টগ্রাম শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায়। চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের প্রয়াত বিশপ যোয়াকিম রোজারিও সিএসসি চট্টগ্রামে থাকলে তিনি সিএসও'র সাথে শহীদ মিনারে যেতেন। বিশপ যোয়াকিম যে চেতনা দিয়ে গেছেন তা ধরে রেখেছে চট্টগ্রামের সিএসও। মহান স্বাধীনতার ৫০ বছরে আমি ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ থেকে শহীদ মিনারে যাই প্রতিবছর। কোন কারণে সম্ভবত ৫/৬ বছর যেতে পারিনি। সিএসও'র এই দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে ফি বছর শহীদ মিনারে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য যাওয়ার রেওয়াজ অব্যাহত রাখতে হবে।

১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা আন্দোলন আমাদের চেতনা সৃষ্টি করেছিল মহান স্বাধীনতা আন্দোলনের। '৫২ ভাষা আন্দোলনের পরবর্তীতে ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের গণঅভ্যুত্থানসহ সকল আন্দোলনের সুতিকাগার ছিল ভাষা শহীদদের জীবন উৎসর্গের ফসল। ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের আকুতোভয় ছাত্র ও যুবরা ছিল দৃঢ় প্রত্যয়ী বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষা দাবীর সংগ্রামে। তাই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানী জান্তা সরকারের ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করেছিল ও মৃত্যুকে আলিঙ্গণ করেছিল ভাষা শহীদ সালাম, বরকত, রফিক, শফিকসহ আরো অনেকে। তাদের মূল্যবান জীবন উৎসর্গের জন্য আমরা পেয়েছি বাংলাদেশ। ভাষা শহীদদের প্রতি রইলো বিনম্র শ্রদ্ধা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে এগিয়ে যাক এই প্রত্যাশা রইলো॥

চাই শুদ্ধ বাংলার উপস্থাপনা ও পরিবেশনা

খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন

বাংলা ভাষা আমাদের প্রাণের ভাষা! এই ভাষাকে আমরা আমাদের আবেগের একেবারে শীর্ষে লালন করি তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু, বাংলাকে প্রয়োগের ক্ষেত্রে, বাংলার মান রক্ষার জন্য আমরা কতটা আবেগী?

উইলিয়াম কেরীর, ফাদার দ্যতিয়েনের, ফাদার মারিনো রিগনের মত আরও অনেক নিবেদিত প্রাণ বিদেশী বাংলাপ্রেমিক ও সাধকের মনে বাংলার শুদ্ধ ব্যবহারের যে প্রয়াস ও নিরন্তর সাধনা ছিল, তাতে তারা সফলতার সাথেই তাঁদের ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিলেন। বিশ্বসভায় বাংলা ভাষাকে একটি সমৃদ্ধ ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে অবদান রেখে গেছেন। আমাদের প্রাণের বাংলা ভাষার ইতিহাসে তাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে। বলা যায়, আমরা অনেকেই জন্মগত ভাবে বাংলার সন্তান হয়েও তাদের মত বাংলা প্রেমের চেতনায় ঋদ্ধ হতে পারিনি। পারিনি বাংলাকে মননে ধারণ করতে।

বলা হয়ে থাকে, ভাষা হল প্রবাহমান নদীর মত। বাস্তবিকই একটি ভাষা নিয়ত; কালের সাথে তার অবয়বে অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনকে পরিধান করে নিচ্ছে। আমাদের বাংলা ভাষাও ব্যতিক্রম নয়। তাই বলে এর অর্থ এই নয়, আমাদের স্বেচ্ছাচারিতার ফসল হবে এই বাংলার চারিত্র। আমরা নিজেরাই বাংলার উৎকর্ষ সাধনের চেয়ে বাংলাকে যথেচ্ছ টেনে হিঁচড়ে পেছনে নিয়ে যাওয়ার জন্য দায়ী।

ইদানিংকার বাংলাদেশের টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে বিজ্ঞাপন চিত্র দেখলে প্রশ্ন জাগে, আমরা শুদ্ধ বাংলা ভাষা ব্যবহারের বেলায় কতটুকু যত্নবান? টেলিভিশনে প্রচারিত বিজ্ঞাপনচিত্রে ব্যবহৃত ভাষার নমুনা আমাদের এই প্রশ্নের মুখোমুখি করে দেয়।

‘ ... Pollution থেকে protect করে’

‘ ... চুল সামলাবো, ShineI করবো’

‘ ... ঘন চুলে সব possible’

‘ ... খাবারকে রাখে garden fresh’

‘ ... চুল পড়া কমায় ৯৮ percent পর্যন্ত’

‘ ... ঝটপট Action

অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, বিজ্ঞাপন দাতারা বাংলাদেশের সবাইকে গুলিয়ে ইংরেজি শিখানোর মহাযজ্ঞে অবতীর্ণ হয়েছে।

প্রকৃত অর্থে, ভাষার সৌন্দর্য, সৌকর্য রক্ষায় পরিশীলিত ভাষায় ভোক্তাদের মন জয় করার চিন্তা নেই তাদের মাথায়। আর বিজ্ঞাপনের ভাষা মানসম্মত হয়েছে কিনা তা ভাবার ও দেখার দায়িত্ব ও সরকার বা সরকারি কোন পক্ষের আছে বলে মনে হয় না। বর্তমানে টেলিভিশনে প্রচারিত অনেক বিজ্ঞাপন দেখলে ও শুনলে স্বভাবতই সকলের মনে এই প্রশ্নের উদ্রেক হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে, ভাষার নিয়মসিদ্ধ ব্যবহার; বাংলা ভাষাচর্চাকে একটি মানসম্মত স্তরে উন্নীত করবে।

ইদানিং টেলিভিশনের সংবাদে এবং জাতীয় দৈনিকেও দেখা যায়, বাংলা ভাষার দৈন্য দশা। রিপোর্টিংয়ের নামে যা বলা হচ্ছে, লেখা হচ্ছে, তা শুনে ও দেখে মনে হচ্ছে দিন যতই যাচ্ছে, যুগপৎ বাংলা ভাষার মান ততই নিচে নেমে যাচ্ছে। বলা বাহুল্য, আমাদের দেশের সরকারের, সর্বক্ষেত্রে বাংলা প্রচলনের মান রক্ষার ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব রয়েছে।

এই সময় মানুষ আমরা খুব বেশি ব্যস্ত। তটস্থ। তাই আমাদের হাতে সময়ও কম। রিপোর্টার যা বলছেন ও লিখছেন, তা নিরীক্ষণ করার সময়ও বড্ড সীমিত। একজন লেখক বা সাংবাদিক ভেবে দেখেন না, তাদের পাঠক ও দর্শক সমাজও ব্যস্ত। এই ব্যস্ততার মধ্যে রিপোর্টারদের বক্তব্যে, লেখকদের প্রতিবেদনে ব্যবহৃত ভাষার রূপ, কতটুকু আদৃত হবে, দর্শক-শ্রোতার, পাঠকের মনে সাড়া জাগাবে, তারা সকলে তাদের পরিসর থেকে কিছু সময় বের করে দর্শনে, শ্রবণে এবং পঠনে মনোনিবেশ করবেন কিনা তা অধিকতর ভেবে দেখার বিষয়।

বর্তমান যুগে ফেসবুকে এবং অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলার ব্যবহার দেখা যায় আরও হতাশাব্যঞ্জক। যে যেমন পারছে, লিখছে, বলছে, যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দিচ্ছে। এখানে তো লেখা সম্পাদনা করার কেউ নেই। নিয়মের বাধ্যবাধকতা নিয়েও কেউ প্রশ্ন তোলেন না।

আমি তাদের অ-কবি, অলেখক বলে অভিহিত করব না। ভাষার চর্চা করা যেমন সকলের অধিকার, তেমনই সকলেরই মনে রাখা দরকার, স্বতঃসিদ্ধ ব্যাকরণ, নিয়ম নীতি মেনেই ভাষার অনুশীলন দরকার। ফেসবুকে, প্রকাশনার বিভিন্ন মাধ্যমে অনেকেই বাংলাতে লেখার চর্চা করছেন। তাদের এই চর্চা সংশ্লিষ্ট লেখকদের কোথায় এনে দাঁড় করছে তা সংশ্লিষ্ট সকলের ভেবে দেখা দরকার।

যিনি লিখছেন, তিনি যদি নিজেকে সত্যই বাংলা ভাষার চর্চাকারি একজন ভাবেন, তবে লেখা প্রকাশ করার পূর্বে প্রয়োগকৃত কোন কোন শব্দ সঠিক হয়েছে কিনা তা অভিধান ঘেঁটে নিশ্চিত হতে পারেন। সকলের মনে রাখা দরকার, যোগাযোগ মাধ্যমে পরিবেশিত বিষয়ে ব্যবহৃত ভাষার মান সঠিক হয়েছে কিনা, তাৎক্ষণিক ভাবে তা দেখার কেউ নেই।

লেখার বা বলার বিষয়বস্তু যতই আকর্ষণীয় হোক না কেন, তা লিখতে বা বলতে যেয়ে প্রতিবেদক বা লেখক যদি খেই হারিয়ে ফেলেন, কথনে, ভাষার প্রয়োগে ও রীতির ও বানানের তোয়াক্কা না করেন তবে তাদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। তাদের সৃষ্টিকর্ম কোন ভাবেই ভোক্তা সমক্ষে গ্রহণযোগ্য হবে না। একই সাথে শুদ্ধ ভাষা চর্চার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকাও প্রশ্নের সম্মুখীন হতে বাধ্য।

এখন তাই আমাদের উচিত, আমরা যারা বাংলা ভাষা নিয়ে চর্চা করি, চিন্তা করি, আমাদের ব্যবসায়, কাজে বাংলাকে ব্যবহার করছি, বাংলার প্রায়োগিক মান নিয়ে যেন সময় নিয়ে চিন্তা ভাবনা করি। বাংলায় কাব্য, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রতিবেদন, সংবাদ যাই লিখি বা বলি, আমাদের প্রিয় মাতৃভাষা বাংলাকে মানসম্মত ভাবেই যেন উপস্থাপন ও পরিবেশন করতে আগ্রহী, যত্নবান ও উদ্যোগী হই। প্রকান্তরে সকলেই আমরা আমাদের প্রিয় বাংলা ভাষার সম্মান রক্ষায় ব্রতী হই॥

মায়ের ভাষা

স্ট্যানলী আজিম

বাংলা মায়ের বাংলা ভাষা
বায়ান্ন সনের রক্তক্ষয়ী ভাষা।
রফিক, জব্বার, বরকত, সালাম
তোমাদের প্রতি হাজারো সালাম।

বাঙালি ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী মহল,
আন্দোলনে ও প্রতিরোধে হয়েছেন অমর।
রাষ্ট্রভাষার দাবি জানিয়ে নেমেছেন
রণক্ষেত্রে,
দিয়েছেন বুকের লালরক্ত রাজসড়কে।

’৪৭ সনে সূত্রপাত ’৫২ সনে পরিসমাপ্তি
তীব্র আন্দোলনে পেয়েছি বাংলা ভাষা,
’৯৮ সনে হয়েছি বাংলা ভাষী
’৯৯ UNESCO দিয়েছে ঘোষণা
আজ অমর একুশে ফেব্রুয়ারি।

ভালবাসার এক অপূর্ব উপহার নিবেদিত জীবন

দুলেন্দ্র ড্যানিয়েল গমেজ

সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা রেখেছেন ঈশ্বর। সৃষ্টির শুরু থেকে অনেকেই সেই পরিকল্পনা সচেতনভাবে বুঝতে ও উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছেন। চেষ্টা করেছেন নিজেদের জীবনাহ্বানের সাথে ঈশ্বরের পরিকল্পনার যোগসূত্র রচনা করতে। তাদের মধ্যে অনেকেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, ঈশ্বরের গৌরব ও মহিমা ঘোষণা ও বৃদ্ধি করাই তাদের জীবনের পরম আনন্দ। তাই তারা নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করেছেন। তারা প্রদীপের ন্যায় নিজেদেরকে তিলে তিলে পুড়িয়ে আমাদের মাঝে ভালবাসার আলো ছড়িয়ে গেছেন। আমার-আপনার জন্য ও ঈশ্বরের গৌরবের উদ্দেশে নিঃশেষিত হয়েছেন, যাতে করে আমরা আলোর পথে চলে ঈশ্বরের ভালোবাসার মানুষ হয়ে উঠতে পারি। আমরা যখন আলোর পথে চলবো তখন এ নিবেদিত জীবন তৃপ্তি পাবে এবং জীবনে পূর্ণতা লাভ করবে।

নিবেদিত জীবন হচ্ছে ঈশ্বরের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে স্বেচ্ছায় ব্যক্তি নিজের ইচ্ছা, আরাম-আয়েশ, প্রিয়জন ও জীবন-যৌবন ত্যাগ করে মণ্ডলীকে সাক্ষী রেখে দরিদ্রতা, বাধ্যতা ও কৌমার্য ব্রত গ্রহণ করে পরম পিতার নিকট সর্ম্পূণরূপে আত্মোৎসর্গ করেন এবং যিশুর ভালবাসা অন্যের সাথে সহভাগিতা করার মধ্য দিয়ে যে জীবন যাপন করে তাকেই নিবেদিত জীবন বলে। মূলত ব্রতধারী-ব্রতধারিণীগণ মানব ও ঈশ্বরের সেবায় নিজেদেরকে উৎসর্গ করেন। তারা ঐশ জনগণকে কেন্দ্রে রেখে ঈশ্বরের ভালবাসার কাজ করে থাকেন। খ্রিস্ট মণ্ডলীতে নিবেদিত জীবনের ধারণা আমরা স্পষ্টরূপে দেখতে পাই। জীবনগুরু যিশুখ্রিস্টকে আদর্শরূপে গ্রহণ করে যাজকসমাজ ও ব্রতধারী-ব্রতধারিণীগণ নিজেদেরকে মানবজাতির কল্যাণের জন্য নিঃশেষ করে থাকেন। তাদের ত্যাগস্বীকার ও সেবাকাজের মাধ্যমে তারা ঈশ্বরের ভালবাসা ও মহিমা প্রকাশ করে থাকেন। তারা আছেন বলেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এত সৌন্দর্যে ও অপূর্বে ভরা রয়েছে। অন্যদিকে নিবেদনের পরিপূর্ণতায় নিবেদিত জীবনের অপূর্ব সৌন্দর্য প্রকাশ পায়। আর এরই মধ্যদিয়ে জগতের সকল জীবনাবস্থার উর্ধ্বে নিবেদিত জীবন স্থান পায়। খ্রিস্টযিশুর নিবেদিত জীবনের সাথে যোগসূত্র রচনা করার মধ্যদিয়ে যাজকসমাজ ও ব্রতধারী-ব্রতধারিণীগণ খ্রিস্টময় হয়ে ওঠেন; হয়ে ওঠেন ভালবাসার অপূর্ব উপহার। তাই সাধু টমাস আকুইনাস নিবেদিত জীবনকে ***"হোমবলি"*** বলে আখ্যায়িত করেছেন।

ঈশ্বর আমাদের এতই ভালবাসেন যে, আমাদের শত দুর্বলতা, অপারগতা ও সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও তিনি আমাদের প্রতিনিয়ত উৎসর্গীকৃত জীবনে আহ্বান করে

যাচ্ছেন। যাতে করে আমরা তাঁর ভক্তজনদের সেবা করতে পারি। আমাদের সকল অযোগ্যতাই যেন তাঁর কাছে যোগ্যতা। তাঁর কৃপায় আমরা যোগ্য হয়ে উঠি। তিনি আমাদের আহ্বান করেন যাতে করে আমাদের জীবনে তাঁর ঐশপরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে পারে। তাঁর ভালবাসা ও মহিমা জগৎ জুড়ে ঘোষিত হতে পারে। নিবেদিত ব্যক্তিরা যেন মঙ্গলসমাচারের ঐশআলো সকলের অন্তরে দিতে পারেন। কারণ দীক্ষাস্নানের মাধ্যমে আমরা যিশুখ্রিস্টের রাজকীয়, যাজকীয় ও প্রাবক্তিক জীবনের অংশীদার হয়েছি। আমরা যখন এই তিনটি বিষয় হৃদয়ে ধারণ ও পালন করি তখন আমরা ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করি। আমরা হয়ে ওঠি ঈশ্বরের ভালবাসার ঐশজনগণ।

ভালবাসার মানব জীবনে ঈশ্বরের দেওয়া এক অপূর্ব উপহার বা মহাদান। স্বয়ং ঈশ্বরই সেই ভালবাসা। "আসলে আমরা যে ভালবাসি কারণ তিনিই প্রথমে আমাদের ভালবেসেছেন *(১ যোহন ৪:১৯)*।" ভালবাসা একটি স্বর্গীয় অনুভূতি। প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে ভালবাসা রয়েছে। আর এই ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটে প্রেমে, সেবায়, ত্যাগস্বীকারে, স্নেহে ও দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে। নিবেদিত ব্যক্তিরা ত্যাগস্বীকারের মাধ্যমে খ্রিস্টযিশুতে মিলিত হন। তাদের জীবনের ভালবাসার সুবাস সবার কাছে ছড়িয়ে দেয় ত্যাগস্বীকারের মাধ্যমে। কারণ সত্যিকার ভালবাসা আসে ত্যাগে, ভোগে নয়। নিবেদিত বা উৎসর্গীকৃত ব্যক্তিরা বাড়ি-ঘর, আত্মীয়-স্বজন, নিজের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা ও জীবন-যৌবন ত্যাগ করে খ্রিস্টযিশুর কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মদান করেন। তারা ঈশ্বরের ইচ্ছাকে হৃদয়াঙ্গম করে আত্মোৎসর্গ করে থাকেন যাতে ঈশ্বরের ভালবাসা প্রকাশিত হতে পারে। বাস্তবতায় আমরা দেখি যে, আত্মত্যাগে ও আত্মদানে প্রকৃত ভালবাসা প্রকাশ পায়। খ্রিস্টযিশু চরম আত্মত্যাগ ও জীবন উৎসর্গের মধ্যদিয়ে বিশ্বমানবতাকে সর্বোচ্চ ভালবাসা উপহার দিয়েছেন। তাই যাজক, ব্রতধারী-ব্রতধারিণীগণ খ্রিস্ট যিশুর আদর্শে আলোকিত হয়ে ঐশজনগণের সেবায় নিজেদেরকে উৎসর্গ করেন। তারা ভালবাসাপূর্ণ সেবা দ্বারা যিশুকে আধ্যাত্মিকভাবে সবার হৃদয়ে স্থানান্তর করেন।

অন্যদিকে ঈশ্বর তাঁর অপূর্ব ভালবাসা প্রকাশ করেছেন মানবদেহ ধারণ করে। আর সেই অপূর্ব ভালবাসার প্রমাণ দিয়েছেন মানুষের মুক্তির জন্য ক্রুশে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে। পৃথিবীতে নিবেদিত ব্যক্তিরা খ্রিস্টযিশুর প্রতিচ্ছবি হিসাবে কাজ করে যাচ্ছেন। যিশুখ্রিস্টের ভালবাসা যেমন অফুরন্ত, অভিনব ও কল্পনার অতীত তেমনি সেই ভালবাসায় রয়েছে কল্যাণময়ী শক্তি। সেই কল্যাণময়ী শক্তি দ্বারা নিবেদিত ব্যক্তিরা ঐশজনগণকে সংঘবদ্ধ করেন ও পথভ্রষ্ট মানুষকে আলোর পথ দেখান। আমাদের পাপের জন্য ক্রুশীয় মৃত্যুর মধ্যদিয়ে যিশু তাঁর অসীম ভালবাসার প্রমাণ দিয়েছেন। আমরা যদি সেই ভালবাসা নিজেদের মধ্যে সহভাগিতা না করি, যদি মানব সেবায় ব্যক্ত না করি তাহলে ঈশ্বরের প্রতি আমাদের সেই ভালবাসা মরীচিকামাত্র। অন্যদিকে ঈশ্বরকে ও প্রতিবেশিকে নিজের মত ভালবাসা সমস্ত আহূতি ও বলিদানের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। তাই আমরা যেন নিবেদিত প্রাণদের মত দৃশ্যমান প্রতিবেশিকে সেবা করার মাধ্যমে অদৃশ্য ঈশ্বরকে ভালবাসতে পারি। সকলের কাছে যেন প্রচার করতে পারি ঈশ্বরের অপূর্ব ও সুমহান পবিত্র দান হচ্ছে ভালবাসা।

নিবেদিত জীবনের আদর্শ ও সর্বপ্রধান চরিত্র হলো আমাদের ত্রাণদাতা প্রভু যিশুখ্রিস্ট। কারণ মোশীর বিধান অনুসারে মা মারীয়া ও সাধু যোসেফ যিশুকে ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করেছিলেন। তাই যারা ব্রতীয় জীবনে রয়েছে তারা সকলেই খ্রিস্টের সেই উৎসর্গীকৃত জীবনের উপর ভিত্তি করে নিবেদিত বা উৎসর্গীকৃত। নিবেদিত জীবনের মধ্যে যিশুই একমাত্র আদর্শ। তাঁর এই অপূর্ব জীবনাদর্শের সঙ্গে আমাদের নিবেদিত জীবন যখন যুক্ত হয় তখন আমরা আমাদের জীবনের প্রকৃত অর্থ ও সৌন্দর্য খুঁজে পাই। কেননা নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তিরাই জগতের সৌন্দর্য। তাদের জীবন হয়ে ওঠে ঈশ্বরের অপূর্ব উপহার।

আমাদের জীবন ভালবাসা হতে সৃষ্টি। আমরা জন্ম নেবার আগে থেকেই ঈশ্বর তাঁর ভালবাসায় আমাদেরকে আবিষ্ট করে রেখেছেন। তিনি আমাদের ভালবেসেই নিবেদিত জীবনে আহ্বান করেন। আমরা যেন তাঁর জন্য ও ভাই মানুষের জন্য আত্মবিসর্জন দিতে পারি। কারণ ব্রতধারী-ব্রতধারিণীদের ঈশ্বরের কাছে আত্মোৎসর্গ করতে হয়। আর সেই আত্মোৎসর্গ অতি পবিত্র বিষয়। সাধারণত লোহা কালচে থাকে। কিন্তু যখন সেই লোহা আগুনে দেওয়া হয় তখন তা লাল হয়ে ওঠে। সেই মুহূর্তে কোনো কালচে চিহ্ন লোহার মধ্যে থাকে না বরং সেটা উজ্জ্বল হয়ে যায়। নিবেদিত জীবনটা ঠিক সেই লোহার মত। যখন ব্রতধারী-ব্রতধারিণীগণ ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত থাকেন তখন তারা ঈশ্বরসন্তান অর্থাৎ পবিত্রময় হয়ে ওঠেন। তখন ঈশ্বর সেই নিবেদিত প্রাণের মধ্যে এবং নিবেদিত প্রাণ ঈশ্বরের মধ্যে থাকে। কোনো পাপ তাদের স্পর্শ করতে পারে না। কারণ তারা স্বয়ং পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিচালিত হন। আর এর মধ্যদিয়ে তারা আগুনে থাকা সেই লোহার মত উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠেন।

প্রতিটি জীবনের মাধুর্য ও সৌন্দর্য রয়েছে। তেমনি ভাবে নিবেদিত বা উৎসর্গকৃত জীবনের সৌন্দর্য প্রকাশ পায় প্রাহরিক প্রার্থনার মাধ্যমে। যাজকগণ ও ব্রতধারী-ব্রতধারিণীগণ প্রতিটি প্রহরে ঐশজনগণের জন্য প্রার্থনা করেন। সমগ্র বিশ্বের মঙ্গল যাচ্না করেন। তাদের এই অপূর্ব জীবনের সুবাস বাতাসের সাথে পরম দয়াময় পিতা ঈশ্বরের নিকট পৌঁছে যায়। ঈশ্বর তাঁর এই নিবেদিত প্রাণের প্রার্থনা কখনও অগ্রাহ্য করতে পারেননা। তাদের ত্যাগস্বীকার ও অতি সাধারণ জীবন যাপনের মধ্যদিয়ে তারা জগতের মধ্যে অসাধারণ হয়ে ওঠে। তাদের এই প্রার্থনার ফলে ঈশ্বর তাঁর অসীম ও অকৃত্রিম ভালবাসা প্রতিনিয়ত আমাদের মাঝে প্রকাশ করছেন।

আজ বিশ্ব ভালবাসা দিবসে সকল যাজক, ব্রতধারী ও ব্রতধারিণীদের শুভেচ্ছা জানাই। কারণ তারা তাদের নিবেদিত জীবন দ্বারা প্রতিনিয়ত ঐশভালবাসা আমাদের অন্তরে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে যাচ্ছেন। সত্যিই ভালবাসা ছাড়া যেমন আমাদের জীবন পূর্ণতা পায় না, তেমনি ভাবে নিবেদিত জীবনের সৌন্দর্যও প্রকাশিত হয় না। খ্রিস্টযিশু তাঁর মৃত্যুর মধ্যদিয়ে নিবেদিত বা উৎসর্গীকৃত জীবনের চরম দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গেছেন। শুধু দৃষ্টান্তই দেখিয়ে যাননি বরং ঐশজনগণকে ভালবেসে ভীষণ কষ্ট সহ্য করেছেন। নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে ভালবাসার চরম নিদর্শন দেখিয়েছেন। অন্যদিকে আমরা তাঁর তেত্রিশ বছর জীবনাদর্শে দেখতে পাই যে তিনি ভালবাসা ও সেবা কাজের মাধ্যমে কিভাবে জগতে ও ঐশজনগণের মাঝে পরিবর্তন সাধন করেছেন। ব্রতধারী-ব্রতধারিণীগণ যেন তাদের জীবন ব্রতে বিশ্বস্ত থেকে খ্রিস্টের সেই ঐশভালবাসা সকল পর্যায়ের মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে পারেন। এই পরিবর্তনশীল আধুনিক যুগে ব্রতধারী-ব্রতধারিণীদের জীবন ব্রতের যেন কোনো পরিবর্তন না ঘটে। তারা যেন সাধ্বী মাদার তেরেজার মত দৃশ্যমান মানুষের সেবা করার মধ্যদিয়ে অদৃশ্য ঈশ্বরকে ভালবাসতে পারেন। তাদের নিবেদিত প্রাণের ভালবাসায় যেন ভরে ওঠে প্রতিটি মানুষের অন্তর। সকল ব্রতধারী-ব্রতধারিণীগণ যেন ত্রিত্ব ঈশ্বরের পরিচালনায় পরিচালিত হতে পারে। তাদের জীবনাদর্শ দ্বারা সকলের কাছে যেন প্রকাশিত হতে পারে **"ভালবাসার এক অপূর্ব উপহার নিবেদিত জীবন।"**

কৃতজ্ঞতাস্বীকার:

১. মঙ্গলবার্তা।

২. জুবিলী বাইবেল।

৩. প্রতিবেশী সংখ্যা ৪,৬-২০১৮, ২০২০।

মহাকাল

মার্ক প্যাট্রিক কস্তা

চারিদিক কি করুণ আকাল
ইবলিশের মহাকাল
বিষাক্ত মরণব্যাধিতে ছেয়ে গেছে
আকাশ-পাতাল।
অসহায় মানবজাতি
প্রতিনিয়ত করছে আর্তনাদ
জেগেছে ভয়ানক নরকের শয়তান
পৃথিবীটা করছে বরবাদ।
শহর-গ্রাম নগরজীবন
হয়ে গেছে ভুতুড়ে
কতশত আজব নিয়ম-কানুন
লাগে যেন অদ্ভুতুড়ে।

লকডাউন, মাস্ক, দূরত্ব
হোম কোয়ারেন্টাইন-ভ্যাকসিন-টিকা,
জীবনের প্রতিটি ক্ষণ যেন আজ
মহাবিভীষিকা।

প্রিয়জন হারানোর বেদনায়
শুকিয়ে গেছে চোখের জল,
কেড়ে নিয়েছে নিষ্ঠুর সময়
কত শত মায়ের বুকের ধন মানিক রতন
বাড়ছে অসহায়ের কোলাহল ক্রন্দন,
মৃত্যুর মিছিলে থেমে গেছে আজ
জীবনের সব স্পন্দন।

উৎকণ্ঠা আর অনিশ্চিয়তায় কাটে
সকাল আর বিকাল,
অমানিশার রাত কবে ভোর হবে;
কাটবে কবে এই ভয়ানক মহাকাল?

একটি অপ্রকাশিত গল্প

মিতালী মারিয়া কস্তা

নূপুরের মা হতবাক হয়ে নূপুরের দিকে তাকিয়ে রইল। তার মুখে কোন কথা আসছে না, চিন্তা-ভাবনা সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ করেই দূরে কোথাও থেকে গুলির শব্দ ভেসে এলো। গুলির শব্দের সাথে সাথে সে যেন সম্বিত ফিরে পেল। মেয়ের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল, আর সাথে সাথেই নূপুর হরহর করে বমি করে দিল। তাকে বমি করতে দেখে তার মা আবারও রেগে যেতে গিয়ে থেমে গেল। তার ভিতরের স্নেহময়ী, মমতাময়ী মাতৃত্ববোধটুকু মনের আগল ঠেলে বেরিয়ে এল। দুহাত বাড়িয়ে মেয়েকে জড়িয়ে ধরল। মায়ের হাতের স্পর্শে নূপুরের সমস্ত শরীর-মন শান্ত হয়ে এল। ধীরে ধীরে মাথা সোজা করে মা'র বুকে মাথা রেখে কাঁদতে শুরু করল। মা আরও শক্ত হাতে মেয়েকে নিজের বুকে জড়িয়ে নেয়। মেয়ের কানে ফিসফিস করে বলে, ভয় নেই মা, আমি তো আছি। মায়ের অভয় বচনে নূপুরের কান্নার মাত্রা আরও বেড়ে যায়। তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন মা মেয়েকে আশ্বাস দিলেও নিজে ভিতরে ভিতরে দিশেহারা বোধ করে। কিভাবে সামলাবেন তিনি সবকিছু!

নির্ঝর ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। পড়াশুনায় তুখোড়। নূপুর এবং নির্ঝরের একই গায়ে বাড়ী। কিশোরী নুপুরের শরীরে যখন মসৃনতা আসতে শুরু করে তখন থেকেই তার পিছু নেয় নির্ঝর। কিশোর-প্রেমের উচ্ছলতায় নূপুরও ভেসে যায় অন্তহীন ভালোবাসায়। কিশোরী মেয়েটি এখন পরিপূর্ণ যুবতী, দ্বাদশ শ্রেণীতে পড়ে। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ। বছরের শুরু থেকেই সারা দেশের মানুষের মনে কেমন একটা চাপা ভয় এবং উত্তেজনা। কি হবে পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে? ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে শীত তখন যাই-যাই করছে। ঝরে পরার আগে গাছের পাতাগুলি অদ্ভুত সুন্দর একটা রঙ ধারণ করে, এসময় কোন কোন গাছের পাতা হয়ে যায় লালচে, আবার কোন কোনটা হলদেটে। এই পাতাগুলি ঝরে পড়ার পর নতুন পাতাটা বের হয় আরও মোহনীয় একটা রঙ নিয়ে। প্রকৃতিতে ছড়িয়ে দেয় সজীবতা, বসন্তের আবেশ। সেই আবেশের মোহময়তায় প্রাগৈতিহাসিক রহস্যে একদিন হারিয়ে গিয়েছিল নূপুর এবং নির্ঝর।

এপ্রিল মাসের শুরুতেই নূপুর জানতে পারে যে নির্ঝর এবং তার বড়দা যুদ্ধে চলে গেছে। খবরটা জানার পর থেকেই নূপুর যতটা না নির্ঝর এবং তার দাদাকে নিয়ে উৎকণ্ঠিত তার চেয়েও বেশী নিজেকে নিয়ে। অজানা একটা ভয় তার গলা চেপে ধরছে। তার এখন নির্ঝরকে দরকার, ভীষণ দরকার। এই কথাটা এখন এক-মাত্র তাকেই বলা যায়। ভয়ে নিজেকে কেমন অপ্রকৃতিস্থের মত লাগে। কি করবে সে এখন? কার কাছে যাবে? কাকে বলবে তার সমস্যার কথা?

নূপুরদের গ্রামটা শহর থেকে অনেক দূরে। বড় রাস্তা থেকে গ্রামে যেতে হলে একটা বিল পার হতে হয়। পাক-বাহিনী সাঁতার জানে না তাই তাদের গ্রামটা এখনও কিছুটা নিরাপদ। কিন্তু তাদের গ্রাম থেকে আতংকিত হয়ে সবাই দেখে যে বড় রাস্তালাগুয়া গ্রামের বাড়ীগুলো একের পর এক আগুনে ঝলসে যাচ্ছে। সেসব গ্রামের মানুষগুলো সমস্ত কিছু ফেলে প্রাণভয়ে রাতের আঁধারে অন্য গ্রামে পালিয়ে যাচ্ছে। সবার মধ্যে ভয় এবং হাহাকার বিরাজ করছে। সব হারানোর ব্যাথা বুকে নিয়ে প্রাণভয়ে যে যার নিরাপদ আশ্রয়ে ছুটে যাচ্ছে। কিন্তু কোথায় নিরাপত্তা? আজ যে এলাকাটা নিরাপদ, কাল সেখানে পাক-বাহিনী এসে হানা দিচ্ছে। শত শত লোক একসাথে বাস করছে। কেউ খাবার পাচ্ছে তো কেউ পাচ্ছে না কিংবা পাচ্ছে না ঘুমানোর জায়গা। বিশুদ্ধ খাবার পানি, নিরাপদ শৌচাগার, মেয়েদের নিরাপত্তা .....! বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য মৌলিক চাহিদাগুলো মিটাতে হিমসিম খাচ্ছে সবাই। এর মধ্যেও বিশাল হৃদয়ের কোন কোন মানুষ নিজেদের কথা ভুলে অকাতরে কাজ করে যাচ্ছে অন্যদের জন্য। হঠাৎ করেই মে মাসের দিকে কানাঘুষা হচ্ছে যে খুব শীঘ্রই হানাদার-বাহিনী আসছে এই গ্রামে হানা দিতে। দ্বিকবিদিক জ্ঞান হারিয়ে এবার ছুটছে এ গ্রামের মানুষ আরও একটা বিল পার হয়ে পরের গ্রামের দিকে। নূপুরের মা চটজল্‌দি খুব প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস গুছিয়ে নেয়ার জন্য নূপুরকে তাড়া দিতে গিয়ে দেখে নূপুর বমি করছে। মায়ের চোখ নিমেষে বুঝে নিয়েছে মেয়ের শারীরিক পরিবর্তন। কারণ নূপুরকে এক সপ্তাহ আগেও বমি করতে দেখেছে সে। জানতে চাইলে নূপুর বলেছে, কিছু না, গ্যাস হয়েছে মনে হয়। কিন্তু আজ মেয়েকে বুকে আগ্‌লে ধরে মা সব কিছু বুঝে গিয়েছে। কান্না থামলে মা সরাসরি জানতে চাইল, কে? নির্ঝর, মেয়ের ছোট্ট উত্তর। মেয়ের গালে কসে কটা চড় দিতে গিয়েও থেমে গিয়ে বলে, তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নাও। হন্তদন্ত হয়ে ছুটছে মানুষ। কারো দিকে কারোর তাকানোর সময় নেই। শক্ত ধাতুতে গড়া নূপুরের মা। তার একমাত্র ছেলে আছে মুক্তিযুদ্ধে আর তার অবিবাহিতা মেয়ে সন্তানসম্ভবা। এই অনাগত সন্তানের বাবাও আছে মুক্তিযুদ্ধে। এতকিছুর পরও এই মা স্থিরবুদ্ধি ধরে রেখেছে। নূপুরের বাবাকে সে কি বুঝিয়েছে নূপুর জানে না। তার বাবা তাকে একটা প্রশ্নও করেনি। বিরূপ এই পরিস্থিতিতে তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করছে মেয়ের যত্ন নিতে।

জুলাইয়ের শেষের দিকে নূপুরের দাদা আর নির্ঝর এলো দেখা করতে। নূপুররা আছে এখন আশ্রিত গ্রামে তাদেরই এক আত্মীয়ের বাড়ীতে। তারা ছোট একটা ঘর পেয়েছে। বাড়ী-ভর্তি আরো অনেক কাছে-দূরের আত্মীয়রা আছে যারা এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে। দাদা এসেছে রাতের অন্ধকারে। সাথে নির্ঝর। নির্ঝরদের এ গ্রামে কোন আত্মীয় নেই, তাই সে বুঝতে পারছে না তার মা-বাবা কোথায়। কারো কাছে জানতে চাওয়াও এ সময় বিপদজনক। কারণ টিকটিকিগুলো ছদ্মবেশে চারিদিকে ঘুরাঘুরি করে। মা-বাবার জন্য মন ব্যাকুল হলেও নির্ঝরের মন বেশি উচাটন নূপুরের জন্য। তাই সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে আগে নূপুরকে দেখতে যাবে। তারপর যদি সম্ভব হয় তবে মা-বাবার সাথে দেখা করবে। নূপুরের মা-বাবা তাদের ছেলেকে দেখে ভয়মিশ্রিত আনন্দে কাঁদে আর নির্ঝরকে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। দাদা আগেই নূপুর আর নির্ঝরের বিষয়টা টের পেয়েছিল। যুদ্ধে একসাথে থাকাকালীন সময়ে নির্ঝর নিজেই সব বলে। নূপুর নির্ঝরকে একাকী কাছে পেয়ে ব্যাকুল হয়ে কাঁদে। বিস্মিত নির্ঝর সব জেনে কিছুটা অবাক হয়, সে বুঝতে পারে না এ সময় কি করবে বা কি করা উচিৎ। শুধু দৃপ্ত কণ্ঠে বলে, দেখো একদিন এ যুদ্ধ শেষ হবে। আর সেদিন এই বিজয়ী আমরা একসাথে থাকব। ততদিন তুমি এবং আমাদের সন্তান যেন ভাল থাকে ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা রেখে গেলাম। ভোর রাতে বিদায়ের সময় নির্ঝরের দাদা নূপুরের মাথায় হাত রেখে তার মা-বাবাকে বলে, তোমরা ওর যত্ন নিও কারণ ও একজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান জন্ম দিবে।

বাড়ী থেকে যাওয়ার দু'সপ্তাহ পর ওরা খবর পায় নির্ঝরের বুকে গুলি লেগেছে। গুলি লাগার পরেও সে কয়েকঘন্টা বেঁচেছিল। সেসময় তাকে ডাক্তারের কাছে নিতে পারলে হয়তোবা বাঁচানো যেত। খবরটা জানার পর নূপুর জ্ঞান হারায়। সময়টা খারাপ তাই চিৎকার করে কাঁদতেও পারে না মেয়েটা। তার চাপা কান্নায় তার মা-বাবাও হয়ে যায় কিংকর্তব্যবিমূঢ়। প্রচণ্ড শোক এবং এ সময়কালীন শারীরিক জটি-লতায় নূপুরের শরীর খুব খারাপ হতে থাকে। তাকে ডাক্তার দেখানো দরকার। কিন্তু কি-ভাবে? শুনা যাচ্ছে হানাদার-বাহিনী খুব কাছেই ঘাঁটি গেড়েছে। সবার ভয় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। এ এলাকা ছেড়ে অন্য এলাকায় চলে যাবে কিনা এই দোটানায় পড়ছে। কেউ কেউ বিষ চোখে নূপুর এবং তার মা-বাবার দিকে তাকাচ্ছে। কারণ হানাদার-বাহিনী নূপুরের দাদার খোঁজে যেকোন সময় এ বাড়ীতে চলে আসতে পারে। আত্মীয়দের স্বস্তি দেওয়ার জন্যই নূপুরের বাবা বাড়ী ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। অন্যান্য আশ্রয়প্রত্যাশী লোকদের সাথে অসুস্থ মেয়েকে নিয়ে হাঁটা দেয় অজানার উদ্দেশে। দুপুর গড়িয়ে

(১২ পৃষ্ঠায় দেখুন)

আলোচিত সংবাদ

স্কুল-কলেজ ও ভার্সিটিতে সশরীরে ক্লাশ শুরু

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে এবং ভার্সিটিতে ক্লাস আজ মঙ্গলবার থেকে শুরু হচ্ছে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে সশরীরে শ্রেণীকক্ষে অংশ নেবে শিক্ষার্থীরা। তবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কিভাবে চলবে এবিষয়ে একটি গাইডলাইন প্রকাশ করেছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি)। এদিকে আগামী ২ মার্চ থেকে দেশের সব প্রাথমিক বিদ্যালয় খুলতে এবং শ্রেণিকক্ষেই পাঠদান কার্যক্রম চালুর ব্যবস্থা নিতে নির্দেশনা দিয়েছে সরকার। নির্দেশনাগুলোর মধ্যে রয়েছে : ১) যেসব শিক্ষার্থী কোভিড-১৯ টিকার দ্বিতীয় ডোজ নিয়েছে, তারা সশরীরে ক্লাস করতে পারবে। ২) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রবেশমুখসহ অন্যান্য স্থানে কোভিড মহামারি সম্পর্কিত সরকার ঘোষিত স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালনে করণীয় বিষয়সমূহ ব্যানার অথবা অন্য কোন উপায়ে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে। ৩) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রবেশপথে সব শিক্ষক, কর্মচারী, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের তাপমাত্রা পরিমাপক যন্ত্রের মাধ্যমে নিয়মিত তাপমাত্রা মাপা ও পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। ৪) পরিস্থিতি বিবেচনায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ অনলাইন শিক্ষাকার্যক্রম অব্যাহত রাখবে। ৫) শিক্ষার্থীদের জন্য বিতরণ করা এ্যসাইনমেন্টসমূহের কার্যক্রম যথারীতি অব্যাহত থাকবে। ৬) এর আগের নির্দেশনা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের ক্লাস রুটিন করতে হবে। ৭) শিক্ষার্থীদের ভিড় এড়ানোর জন্য প্রতিষ্ঠানের সবগুলো পথ ব্যবহার করা ও যদি একটি প্রবেশ পথ থাকে তবে একাধিক প্রবেশ পথের ব্যবস্থা করতে হবে। ৮) প্রতিষ্ঠান খোলার প্রথম দিন শিক্ষার্থীদের আনন্দঘন পরিবেশে শ্রেণি কার্যক্রমে স্বাগত জানানোর ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে। ৯) প্রতিষ্ঠান খোলার প্রথম দিন শিক্ষার্থীরা কিভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রতিষ্ঠানে অবস্থান করবে ও বাসা থেকে যাওয়া-আসা করবে সেই বিয়য়ে তাদের ব্রিফ করতে হবে। ১০) প্রতিষ্ঠানের একটি কক্ষ প্রাথ মিক চিকিৎসার ব্যবস্থাসহ আইসোলেশন কক্ষ হিসেবে প্রস্তুত রাখতে হবে। ১১) প্রতিষ্ঠানের সব ভবনের কক্ষ, বারান্দা, সিড়ি, ছাদ ও আঙ্গিনা যথাযথভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। ১২) প্রতিষ্ঠানের সব ওয়াশরুম নিয়মিত সঠিকভাবে পরিষ্কার রাখা ও পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা রাখা। ১৩) সব শিক্ষক, কর্মচারী, শিক্ষার্থী, অভিভাবকসহ অন্য কেউ প্রবেশ/অবস্থান/প্রস্থানের সময় সরকার ঘোষিত স্বাস্থ্যবিধি যথাযথ ভাবে প্রতিপালন করতে হবে। ১৪) সব শিক্ষক, কর্মচারী, শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট অন্য সবাইকে সঠিকভাবে মাস্ক পরিধান করার বিষয়টি নিশ্চিত করা। ১৫) প্রতিষ্ঠানে হ্যান্ডওয়াশ বা সাবান দ্বারা হাত ধোয়ার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখতে হবে। ১৬) শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের বসার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে অনুসরণ করা; এক্ষেত্রে পারস্পরিক তিন ফুট শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার ব্যবস্থা করা। ১৭) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের খেলার মাঠ, ড্রেন ও বাগান যথাযথভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা ও কোথাও যেন পানি জমে না থাকে তা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করা। ১৮) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির সংখ্যা নিরুপণ করা। ১৯) প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি মেনে আনন্দঘন শিখন কার্যক্রম পরিচালিত করা। ২০) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি ও অভিভাবকদের সঙ্গে সভা করে এ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

"জয় বাংলা" জাতীয় স্লোগান

'জয় বাংলা'কে জাতীয় স্লোগান করা হচ্ছে। এ বিষয়ে মন্ত্রিসভা বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে শীঘ্রই এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপণ জারি করা হবে। এক ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে গণভবন থেকে প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সভাকক্ষ থেকে মন্ত্রি ও প্রতিমন্ত্রিরা বৈঠকে যোগ দেন। বৈঠক শেষে সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়রুল ইসলাম সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান। তিনি বলেন 'জয় বাংলা'কে জাতীয় স্লোগান করার বিষয়ে মন্ত্রিসভা বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে। ২০২০ খ্রিস্টাব্দে হাইকোর্টে একটি রায়ও আছে- 'জয় বাংলা'কে জাতীয় স্লোগান হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। অবিলম্বে একটি প্রজ্ঞাপন জারি করতে হবে; কোথায় কোথায় "জয় বাংলা" বলতে হবে- এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, তিন-চারটি ক্যাটাগরির কথা বিবেচনাধীন আছে। সাংবিধানিক পদধারীগণ, রাষ্ট্রের সব কর্মকর্তা-কর্মচারী রাষ্ট্রীয় বা সরকারী অনুষ্ঠানের শেষে এটা বলবেন। সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মাদ্রাসা সহ তাদের কোন সভা-সেমিনার যদি হয়, যে কোন ধরনের সমাবেশ হলে সেখানে 'জয় বাংলা' স্লোগান দিতে হবে। যদি কোন অনুষ্ঠান হয়, সমাবেশ হয় সরকারি-বেসরকারি যারা থাকবেন 'জয় বাংলা' স্লোগান ব্যবহার করবেন; এটা কেবিনেটের সিদ্ধান্ত।

আগামী বছর থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সাপ্তাহিক ছুটি দুই দিন

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি জানিয়েছেন, আগামী বছর থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সপ্তাহে শুক্র ও শনিবার দুই দিন সাপ্তাহিক ছুটি থাকবে। তিনি বলেন, "আমরা যখন কারিকুলামের রূপরেখা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে গিয়েছিলাম, তখনই তিনি বলেছেন, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষায় দুই দিন ছুটি করতে চাই। পাঁচ দিন খুব মনোযোগ দিয়ে পড়বে, তার পর দুই দিন ছুটি থাকা দরকার।

২৬ ফেব্রুয়ারি টিকার প্রথম ডোজ বন্ধ হচ্ছে না

আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি শনিবার করোনার টিকার প্রথম ডোজ দেয়ার কার্যক্রম শেষ হচ্ছে না। এরপরও স্বাভাবিক টিকা কর্মসূচী চলমান থাকবে। টিকা গ্রহণে মানুষের ব্যাপক আগ্রহের কারণে সরকার তার সিদ্ধান্ত বদল করেছে। এর আগে গত ১৫ ফেব্রুয়ারি স্বাস্থ্য অধিদফতর জানিয়েছিল প্রথম ডোজ টিকা প্রয়োগ কার্যক্রম আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি শেষ হবে। মঙ্গলবার রাজধানীর মহাখালীতে বিসিপিএস ভবনে '২৬ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী অনুষ্ঠিতব্য একদিনে এক কোটি ডোজ ভ্যাকসিন প্রদান কার্যক্রম' বিষয়ক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী জাহিদ মালেক। মন্ত্রী বলেন, ২৬ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী টিকাদান কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছে। সবাইকে আহ্বান করব টিকা নেয়ার। আমরা সবাইকে টিকা দেব। এরপর থেকে দ্বিতীয় ডোজ ও বুস্টার ডোজের কার্যক্রম নিয়ে ব্যস্ত থাকব। তবে সাময়িকভাবে প্রথম ডোজে একটু দৃষ্টি কম থাকলেও কার্যক্রম চলমান থাকবে। তিনি বলেন, আমরা বিশেষ এই টিকা কর্মসূতীতে এক কোটি ডোজ টিকা দেয়ার প্রস্তুতি নিয়েছি। প্রয়োজনে দেড় কোটি ডোজ দেব। ১০ কোটি ডোজ টিকা আমাদের হাতে রয়েছে। আমরা এর আগেও একদিনে ৮০ লাখের বেশি টিকা দিয়েছি। এ সময় করোনার সংক্রমণ ঠেকাতে টিকা প্রয়োগ কার্যক্রমে রাশিয়া-তুরস্কের চেয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে আছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী জাহিদ মালেক। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক সংস্থা ব্লুমবার্গ প্রশংসা করে আমাদের জানিয়েছেন, বিশ্বের ২০০টি দেশের মধ্যে ভ্যাকসিনেশনে বাংলাদেশ দশম অবস্থানে জায়গা করে নিয়েছে॥

করোনা পরিস্থিতির আপডেট	তারিখ	২৪ ঘন্টায় নমুনা পরীক্ষা	২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত	আক্রান্তের হার	২৪ ঘন্টায় মৃত্যু	২৪ ঘন্টায় সুস্থ
	১৯/০২/২০২২	২৪৬৯৮	২১৫০	৮.৭১	১৩	৯৪৭৮
	২০/০২/২০২২	২৪৪০৫	১৯৮৭	৭.৮২	২১	৯২৫২
	২১/০২/২০২২	২৮০৯৭	১৯৫১	৬.৯৪	৯	৮৬৭৪
	২২/০২/২০২২	২৩৫৪৭	১৫৯৫	৬.৭৭	১৬	৮৩৫৭

ভস্ম বুধবার ভস্মে রূপদান

মাস্টার সুবল

আমার কল্পনায় বুধবার দিনে ভস্ম ব্যবহারে বুধবার দিনটা ভস্ম বুধবারে রূপদান পেয়েছে। কাঠ বা লতা-পাতা আগুনের উত্তাপে পোড়ালে যা পাওয়া যায় তা হলো ভস্ম বা ছাই। আগুন বা উত্তাপ এক প্রকার শক্তি। শক্তি ছাড়া কোন কাজ পাওয়া যায় না। কয়লা গুড়া বা ফাঁকি করে ভস্ম তৈরি করা হয়। কয়লার মত বিচিত্র বস্তু পৃথিবীতে আর একটিও নাই।

বিজ্ঞানের কথা, কয়লা, গ্রাফাইট আর হীরা মাটির নিচে খনিতে বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়।গ্রাফাইট আর হীরা কয়লা থেকেই উৎপন্ন হয় অর্থাৎ গ্রাফাইট আর হীরা, কয়লার অবস্থারই পরিবর্তন। অত্যধিক তাপ ও চাপের ফলে কয়লা মাটির নিচে গ্রাফাইট ও হীরায় পরিণত হয়। আসল হীরা স্বচ্ছ ও বর্ণহীন এবং পৃথিবীর মধ্যে কঠিনতম প্রাকৃতিক বস্তু। আসল হীরার মধ্য দিয়ে তাপ ও বিদ্যুৎ চলতে পারে না। রঞ্জন রশ্মির সাহায্যে আসল ও নকল হীরার পার্থক্য করা যায়। নকল হীরার মধ্য দিয়ে এই রশ্মি যেতে পারে না। নকল হীরা দেখতে কালো। গ্রাফাইট তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবাহী। বিদ্যুৎ শলাকারূপে এবং পেন্সিলের সীস তৈরি করতে প্রচুর পরিমাণে গ্রাফাইট ব্যবহৃত হয়। আবার বায়ুশূন্য আবদ্ধ পাত্রে কাঠ উত্তাপে পোড়াইয়া কয়লা বা অঙ্গার পাওয়া যায়। আলকাতরা তৈরি করতে কয়লা ব্যবহার করা হয়। আলকাতরা দিয়া রং, ঔষধ, সুগন্ধী, প্লাস্টিক, কৃত্রিম রাবার, বিস্ফোরক প্রভৃতি প্রস্তুত করা হয়। চিনিকে সাদা করার জন্য কয়লা ব্যবহার করা হয়। আসল হীরার মধ্যদিয়ে আলো নানাভাবে বেঁকে যায় বলে একে চকচকে দেখায়। হীরাকে সুন্দর দেখায় আলোর মধ্যে, অন্ধকারে নয়। দামী অলঙ্কারে রত্ন হিসাবে হীরা ব্যবহার করা হয়। কাঁচ কাটার যন্ত্রে হীরা ব্যবহার করা হয়।

বলার কথা, কয়লা বিশুদ্ধ, নরম এবং বর্ণে কালো কিন্তু উত্তাপে রূপান্তরে স্বচ্ছ, বর্ণহীন, কঠিনতম বস্তু হীরায় পরিণত হয়। কয়লা ভস্মাকারে ধূলো হয় আর এ ধূলোই ভস্ম বুধবারে যাজকগণ মানবদেহে লেপন করে বলেন, "তুমি ধূলো, আর ধূলোতেই আবার ফিরে যাবে।" মৃত্যুর পর আত্মা মানুষের কর্মজীবনের কঠিনতম রূপান্তরের মাধ্যমে স্বচ্ছ ও বর্ণহীনতায় স্বর্গসুখ লাভ করে॥

মেঘা মারীয়া গমেজ
হলি চাইল্ড আইডিয়াল স্কুল
৪র্থ শ্রেণি

একুশ হবে আমার

জেসিকা লরেটো ডি' রোজারিও

বাংলাকে আমি বারবার চাই, চাই একাত্তর,
স্বাধীনতার,
তিরিশ লক্ষ শহীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে
স্বাধীনতা, একুশে হবে আমার।
শুধু দিবস নয় অমর একুশে, সারাবছরই
হোক শুদ্ধ বাংলার চর্চা
এই শোকে, এই সাদা কালোতে মিশে
আছে আমার, লাল সবুজের সত্তা।
আমি এক স্বাধীন বাংলা ভাষা চাই, যেখানে
থাকবেনা পরাধীনতা,
স্বগৌরবে জাগ্রত কোটি প্রাণ গাইবে বরণীয়
৭১ এনেছে স্বাধীনতা।
আমি মিশ্রতা নয়, একনায়কতা চাই,
বাংলাই হোক শ্রেষ্ঠ,
ভাষা হতে চাই প্রতিবাদের, পৃথিবী দেখুক
দুঃসাহসিক এক দৃশ্য।
আমি থেমে যেতে নয়, থমকে দিতে এসেছি
বদলে গিয়ে নয়, বদলে যাওয়াকে
ভালোবেসেছি।
একুশকে পুঁজি করে, এসেছি ঝড় তুলতে,
এসেছি কোটি প্রাণের স্পন্দনে সাড়া ফেলতে।
আমি ফিরে ফিরে চাই বাংলায় তুলতে ঝংকার,
উন্নতশির চিরগৌরবে বলছি আজ,
একুশ হবে আমার।

একুশ তোমার জন্যে

রুমা জেকলিনা কস্তা

চারিদিক এখনো অন্ধকার
ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক এখনো থামেনি,
সকাল হবার অপেক্ষায় থেকে থেকে
দু'চোখে আমার ঘুম আসেনি।

কুয়াশার চাদরে মোড়া
কাকডাকা ভোর-
লাগছে আজ বড়ই বেদনাবিধুর।
শিমুলের ডালগুলো
সূর্যের রংয়ে রাঙ্গা হয়ে
সেজেছে আজ,
গাঁদাফুলগুলো যত্নে গড়েছি
গাঁথবো ফুলমাল্যরাজ।
আজ যে অমর একুশে ফেব্রুয়ারি,
দামাল ছেলের আত্মবলিদানের গর্বে
আজ বাংলা মায়ের বুক ভারি।
আজ আমি চিৎকার করে
বাংলার গান গাইবো-
শ্রদ্ধা ভরে শহীদদের স্মরণে
ফুলে ফুলে ছেয়ে দেবো।
বাংলা আমার প্রাণের ভাষা
সযতনে করবো লালন,
বাংলা বুকে রাখবো ধরে
যতদিন আছে এই জীবন।

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রবীণদের ফলপ্রসূতা প্রতিফলিত হয়েছে ২য় বিশ্ব দাদা-দাদি ও প্রবীণ দিবসের মূলভাবে

গত ১৫ ফেব্রুয়ারি পোপ ফ্রান্সিস টুইটের মধ্যদিয়ে ২য় বিশ্ব দাদা-দাদি ও প্রবীণ দিবসের মূলসুর ঘোষণা করেছেন। এবছর ২৪ জুলাই, ২০২২ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ব দাদা-দাদি ও প্রবীণ দিবস পালিত হবে। এ দিবসের মূলসুর হিসেবে পোপ মহোদয় বেছে নিয়েছেন সামসঙ্গীত ৯২:১৫ পদটি - 'বৃদ্ধ বয়সেও তারা ফলশালী হবে'। প্রজন্মের মধ্যে সংলাপ বৃদ্ধিকল্পে বিশেষভাবে দাদা-দাদি ও নাতি-নাতিনদের মধ্যকার কথোপকথনের উপর জোরারোপ করে তিনি এ বিষয়টিকে বেছে নিয়েছেন।

বিশ্ব দাদা-দাদি ও প্রবীণ দিবস একবছর আগে ২০২১ খ্রিস্টাব্দে পোপ ফ্রান্সিস প্রবর্তন করেন। গত বছর দিবসটিকে নির্ধারণ করার দিনে পোপ মহোদয় খ্রিস্টযাগের সময় মঙ্গলসমাচারের রুটি বৃদ্ধির আশ্চর্যকাজের উপর অনুধ্যান রাখতে গিয়ে তিনটি মুহূর্তের কথা উল্লেখ করেন। জনতা ক্ষুধার্ত যিশু তা দেখলেন, তিনি রুটি ভেঙ্গে তা সহভাগিতা করলেন এবং খাবার পর অবশিষ্টাংশ সংগ্রহ করলেন। এই ৩টি অংশকে তিনি তিনটি ক্রিয়াতে বর্ণনা করেন এভাবে- তিনি দেখলেন, সহভাগিতা ও সংরক্ষণ করলেন। এখন তিনি বিশ্ব দাদা-দাদি ও প্রবীণ দিবস উদ্বোধন কালে উক্ত ব্যক্তিদেরকে 'সে রুটি/খাদ্য যা আমাদেরকে পরিপুষ্ট করে' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

মূলভাব: কিভাবে দাদা-দিদা এবং প্রবীণেরা সমাজ ও মণ্ডলীতে মূল্যবান ও উপহার হয়ে ওঠে তা জোর দেবার পরিকল্পনা/ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই মূলভাবটি একইসাথে দাদা-দিদা ও প্রবীণদের মূল্য দেবার ও বিবেচনায় আনতে আমন্ত্রণ জানায়। কেননা তাদেরকে প্রায়শই পরিবার, সাধারণ ও মাণ্ডলিক সমাজে প্রান্তিক পর্যায়ে রাখা হয়। প্রকৃতপক্ষে দাদা-দিদা ও প্রবীণদের জীবন এবং বিশ্বাসের অভিজ্ঞতা এমন সমাজ গঠনে অবদান রাখতে পারে যেগুলি বর্তমান প্রজন্মকে তাদের শিকড় সম্পর্কে সচেতন এবং বৃহত্তর সংহতির ভিত্তিতে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখাতে সক্ষম। প্রবীণদের প্রজ্ঞার কথা শোনাও মণ্ডলী কর্তৃক গৃহীত সহযাত্রিক মণ্ডলীর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ভক্তজনগণ, পরিবার ও জীবন বিষয়ক পোপীয় দপ্তর বিশ্বের সকল ধর্মপল্লী, ধর্মপ্রদেশ, বিভিন্ন এসোসিয়েশন এবং মাণ্ডলিক সংঘগুলোকে আহ্বান করছে তাদের নিজেদের পরিস্থিতি ও পালকীয় দিকগুলো বিবেচনায় রেখে দিবসটি যথাযথভাবে পালন করতে।

পোপ মহোদয় ও প্রবীণেরা: পোপ ফ্রান্সিস প্রায়ই দাদা-দাদি ও বয়স্কদের সুরক্ষা ও মনোযোগ দানের গুরুত্বের কথা ব্যক্ত করেন। কোভিড-১৯ মহামারির সময় যখন প্রবীণেরা সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হচ্ছিল তখন পোপ মহোদয় যুবদেরকে উদাত্ত আহ্বান করেন প্রবীণদের কাছাকাছি থাকার। গত দু'বছর আগে আর জন্মদিনের আগের সন্ধ্যায় পোপ ফ্রান্সিস বলেন, প্রবীণদের প্রার্থনা শক্তিশালী। প্রবীণ বয়স একটি আশীর্বাদ, ঈশ্বরের মুক্তিদায়ী পরিকল্পনায় যাদের বিশেষ ভূমিকা আছে।

কার্ডিনাল পারোলিন ইউক্রেনীয় জনগণের প্রতি ভাতিকানের সমর্থন প্রকাশ করেছেন

গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ভাতিকানসিটির সেক্রেটারী কার্ডিনাল পিয়েত্ত পারোলিন কিয়েভ-হালচ এর পূজ্যপাদ আর্চবিশপ স্বিয়াস্বোসলাবকে টেলিফোন করে ইউক্রেনের এই কঠিন দ্বন্দ্বমুখর সময়ে ইউক্রেনীয় কাথলিক চার্চ ও ইউক্রেনের জনগণের পাশে ভাতিকানের সমর্থনের কথা ব্যক্ত করেন। আর্চবিশপ স্বিয়াস্বোসলাব রাশিয়ার এই ভয়াবহ আক্রমনের হুমকির মুখে ইউক্রেনীয় গ্রীক কাথলিক চার্চ কিভাবে কাজ করছে তা কার্ডিনালকে জ্ঞাত করেন এবং এই দুঃসময়ে তাদের পাশে থাকার জন্য ভাতিকানকে ধন্যবান দেন। পোলাণ্ডের বিশপগণ রাশিয়া ও ইউক্রেনের চার্চকে অনুরোধ করেন শান্তির জন্য প্রার্থনা করতে। এই একই আহ্বান পোপ ফ্রান্সিস ১৪ ফেব্রুয়ারি দূত সংবাদ প্রার্থনার পর সকল মানুষের কাছে রাখেন। ইউক্রেনের জনগণ ইউক্রেনে শান্তির জন্য পুণ্যপিতার বিশেষ সদিচ্ছা অনুভব করেন এবং বর্তমানের এই আন্তর্জাতিক সংকট কাটিয়ে ওঠতে ভাতিকানের কূটনৈতিক প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন।

এদিকে পোলাণ্ডের বিশপগণ তাদের দেশের জনগণকে অনুরোধ করেন ইউক্রেনীয় উদ্বাস্তুদের গ্রহণ ও স্বাগত জানাতে।

২০২৫ খ্রিস্টাব্দে জয়ন্তী পালনের জন্য প্রার্থনাপূর্ণ প্রস্তুতির আহ্বান

আসন্ন ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে জয়ন্তী পালনের লক্ষ্যে চার্চগুলোর মধ্যে প্রস্তুতি শুরু হতে যাচ্ছে। নতুনভাবে মঙ্গলবাণী ঘোষণা বিষয়ক পোপীয় দপ্তরের প্রেসিডেন্ট আর্চবিশপ রিনো ফিসিচেল্লার কাছে এক পত্রে পোপ মহোদয় উল্লেখ করেন, জয়ন্তী সব সময়ই মণ্ডলীর জীবনে একটি মহৎ

আধ্যাত্মিক, মাণ্ডলিক ও সামাজিক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। তিনি স্মরণ করেন, ১৩০০ খ্রিস্টাব্দে প্রথমবারের মত পুণ্যবর্ষ ঘোষিত হয়। তারপর তিনি স্মরণ করেন, ২০০০ খ্রিস্টবর্ষের মহান জুবিলীর কথা, যাকে তৃতীয় সহস্রাব্দের মহান সূচনা হিসেবে বর্ণনা করেন। মহান জয়ন্তীকে সাধু পোপ ২য় জন পল, দীর্ঘ প্রতীক্ষিত ও ব্যাপক অপেক্ষার বিষয় বলে আখ্যায়িত করেন এবং এই অপেক্ষা এই আশায় যে, সমস্ত খ্রিস্টানগণ তাদের ঐতিহাসিক বিভাজনগুলিকে পিছনে ফেলে যিশু খ্রিস্টের ২০০০ তম জন্মবার্ষিকী একসাথে উদ্‌যাপন করতে পারবে। এখন নতুন শতাব্দীর প্রথম পঁচিশ বছর শেষ হবার সাথে সাথে, আমাদেরকে প্রস্তুতির একটি মৌসুমে প্রবেশ করতে বলা হচ্ছে যা খ্রিস্টান জনগণকে তার সমস্ত যাজকীয় সমৃদ্ধির সাথে পবিত্র বছরটি উপভোগ করতে সক্ষম করে তুলবে বলে মনে করেন পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস।

- তথ্যসূত্র : *news.va*

মোড়ক উন্মোচন

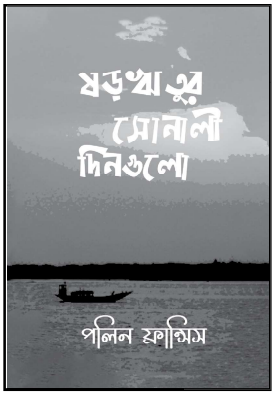

ভাষার মাসকে সামনে রেখে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হলো পলিন ফ্রান্সিসের লেখা "ষড়ঋতুর সোনালী দিনগুলো" বইটি। সদ্য প্রকাশিত বইটির মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে গত ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ। মোড়ক উন্মোচন করেছেন পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই। লেখকের "ষড়ঋতুর সোনালী দিনগুলো" বইটিতে ওঠে এসেছে তাঁর জীবনের সাথে জড়িয়ে থাকা ষড়ঋতুর বিভিন্ন দিক। অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় লেখা বইটি পড়ে সকল স্তরের মানুষ আনন্দ পাবে বলে বিশ্বাস করি। সকলের অবগতির জন্য জানান যাচ্ছে যে, লেখক পরিচিতিতে প্রথম প্রবন্ধ বিশ্ব নারী বর্ষ উপলক্ষে "গৃহকে সু-গৃহে পরিণত করার উপায়" এর পরিবর্তে হবে "মায়ের ভূমিকায় নারী" প্রকাশ কাল ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ। অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য দুঃখিত।

দিনাজপুরে নিবেদিত দিবস পালন

সিস্টার সিসিলিয়া সিং এসসি ▯ “এক তীর্থযাত্রী মণ্ডলী: মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ কাজ” এই মূলসুরকে সামনে রেখে গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দে রোজ বৃহস্পতিবার দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীতে “নিবেদিত দিবস” পালন করা হয়। এই দিনটিকে আরো তাৎপর্যপূর্ণ করার জন্য অর্ধদিবসের একটি ক্ষুদ্র আয়োজন করা হয়। একটি ক্ষুদ্র প্রার্থনা দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। প্রার্থনার পরে ফাদার মাকুর্স মুর্মু “নিবেদিত জীবন” এর তাৎপর্য তুলে ধরেন। পর্যায়ক্রমে দু'জন খ্রিস্টভক্ত তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করেন। পরবর্তীতে প্রজ্বলিত মোমবাতি হাতে শোভাযাত্রার মধ্যদিয়ে পর্বীয় খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের শ্রদ্ধেয় বিশপ সেবাস্টিয়ান টুডু ডিডি, ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার মাইকেল ক্রুশ এবং ধর্মপ্রদেশে কর্মরত কয়েকজন ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারগণ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন গঠনগৃহের প্রার্থীগণ ও হোস্টেলের ছেলেমেয়েরা। পবিত্র খ্রিস্টযাগের পর শুভেচ্ছা বিনিময়, ছোট্ট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ভোজের মধ্যদিয়ে দিনটির কার্যক্রমের সমাপ্তি হয়॥

ধানজুড়ী ধর্মপল্লীতে শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন

ফাদার ভিনসেন্ট মুর্মু ▯ গত ২৮ জানুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার, আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের ধর্মপল্লী ধানজুড়ীতে ৮০ জন শিশু ও এনিমেটরদের নিয়ে শিশুমঙ্গল দিবস পালন করা হয়। শুরুতে শোভাযাত্রা করে গির্জা ঘরে প্রবেশ করা হয়। খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন পালপুরোহিত ফাদার মাইকেল তিগ্যা। “শিশুদের আমার কাছে আসতে দাও” যিশুর এই উক্তির উপর তিনি উপদেশ বাণী প্রদান করেন। সেই সাথে তিনি মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণকর্মের উপরও কিছু কথা সহভাগিতা করেন। তিনি বলেন, সবাইকে যিশুর ন্যায় শিশুদের গ্রহণ করতে হবে এবং তাদের মত নম্র হতে হবে। এছাড়াও শিশুদেরকে বলেন, শিশুদের কাজ হল-পড়াশুনা করা, প্রার্থনা করা, বাধ্য থাকা ও বড়দের শ্রদ্ধা ও সম্মান করা। খ্রিস্টযাগ শেষে ব্যানার নিয়ে র‍্যালি বের করা হয়। টিফিন প্রদানের পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান জাঁকজমকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। সবার শেষে লটারি ড্র করা হয়। অতঃপর, প্রীতিভোজের মধ্যদিয়ে শিশু মঙ্গল দিবস সমাপ্ত করা হয়॥

মুশুরীখোলায় দুঃস্থদের মাঝে কম্বল বিতরণ

হিরণ গমেজ ▯ গত ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার সাভার উপজেলাধীন মুশুরীখোলা এলাকায় সূর্যোদয় হিউম্যানিটি নারী উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে কারিতাস ঢাকা অঞ্চলের সহযোগিতায় চাইড়া, শ্যামপুর, চরতুলাতুলি, দক্ষিণ সেইটকা, ভাকুর্তা, খাগুড়য়া, কানারচর, যাদুরচর ও হারুরিয়া গ্রামের দুঃস্থ মহিলাদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন জ্যোতি গমেজ, পরিচালক, কারিতাস ঢাকা অঞ্চল। উপস্থিত ছিলেন ফাদার প্রশান্ত টি রিবেরু এবং ড. ইসিদোর গমেজ।

এ অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংস্থার সাধারণ সম্পাদিকা মিসেস অদিতি রোজারিও। অতঃপর সংস্থার জেনারেল ম্যানেজার ডেনিস রোজারিও সূর্যোদয় হিউম্যানিটি নারী উন্নয়ন সংস্থার মানবিক ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, কর্ম এলাকার ব্যাপ্তি/পরিধি এবং এর সাথে সম্পৃক্ত নারী ও শিশুদের পরিসংখ্যান উল্লেখপূর্বক বক্তব্য রাখেন। ফাদার প্রশান্ত তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন।

প্রধান অতিথি জ্যোতি গমেজ বলেন, কারিতাস জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে দুঃস্থ ও পিছিয়েপড়া মানুষের জন্য কাজ করে। এরপর ড. ইসিদোর গমেজ সহভাগিতা করেন।

কম্বল বিতরন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ”সূর্যোদয় হিউম্যানিটি নারী উন্নয়ন সংস্থা”র কোষাধ্যক্ষ মিসেস আইরিন আক্তার। তিনি কারিতাস বাংলাদেশের সহায়তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান এবং তাদের পাশে থাকার অনুরোধ রাখেন। অতঃপর তালিকাভুক্ত সবার মাঝে কম্বল বিতরণ করেন প্রধান অতিথি ও অতিথিবৃন্দ॥

মথুরাপুর ধর্মপল্লীতে পালকীয় কর্মশালা-২০২২

মাইকেল হেম্ব্রম ▯ গত ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার, "দায়িত্বপ্রাপ্ত সেবকের আহ্বান: কৃতজ্ঞ হও" এই মূলসুরের উপর ভিত্তি করে অর্ধদিবস ব্যাপী ধর্মপল্লীর 'পালকীয় কর্মশালা' মথুরাপুর ধর্মপল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পাল-পুরোহিত ফাদার শিশির নাতালে গ্রেগরী, সহকারী পাল-পুরোহিত ফাদার স্বপন মার্টিন পিউরীফিকেশন, ধর্মপল্লীর সিস্টারগণ, পালকীয় পরিষদের সকল সদস্য, অন্যান্য সংঘ (প্রভাত তারা, এসভিপি, মারীয়া সংঘ, বিসিএসএম, ওয়াইসিএস ইত্যাদি) থেকে দুই জন করে এবং প্রত্যেক গ্রাম থেকে ৮ জন করে অংশগ্রহণকারী নিয়ে মোট ১১০ জন এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালার শুরুতেই সকাল ৮:৩০ মিনিটে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার শিশির নাতালে গ্রেগরী -এর মধ্যদিয়েই দিনের কর্মসূচী শুরু হয়। এরপর ক্ষুদ্র প্রার্থনা, নৃত্য ও পাল-পুরোহিতের স্বাগত বক্তব্যের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়। তারপর কর্মশালার মূলসুর: "দায়িত্বপ্রাপ্ত সেবকের আহ্বান: কৃতজ্ঞ হও" এর উপর সহভাগিতা করেন ফাদার যোহন মিন্টু রায়। তিনি বলেন, প্রত্যেকটি জিনিসের যেমন ভিত্তি রয়েছে, তেমনি খ্রিস্টমণ্ডলীর ভিত্তি হচ্ছে কৃতজ্ঞ হওয়া, তাই আমাদের উচিত ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা। একই সাথে এ অনুষ্ঠানে সিনোডাল চার্চের উপর সহভাগিতা করেন ফাদার দিলীপ এস. কস্তা। তিনি তার সহভাগিতায় সিনোডের যে তিনটি বিশেষ দিক- মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ রয়েছে সে বিষয়গুলো সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোকপাত করেন। তিনি আরো বলেন, "আমরা কেউই বিচ্ছিন্ন নই, পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাসের যোগসূত্র রয়েছে- আমাদের বিশ্বাস এক, কাজ এক এবং লক্ষ্য এক"।

তারপর অংশগ্রহণকারীদের গ্রাম ভিত্তিক কয়েটি দলে বিভক্ত করা হয় এবং উক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে তাদের দুটি করে প্রশ্ন দেওয়া হয়। তারা সেগুলো নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করার পর দলীয় আলোচনার রিপোর্ট পেশ করেন। শেষে পাল-পুরোহিত সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং দুপুরে মধ্যাহ্ন ভোজের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হয়॥

না ফেরার দেশে চলে গেলেন সিস্টার সেলিন মারান্ডী সিআইসি

"তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম..."

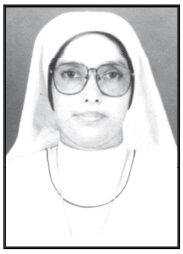

সিস্টার যোসপিন সরেন, সিআইসি ▯ বিগত শনিবার ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ ঠিক পঁচিশ দিনের ব্যবধানে আবারও শান্তি রাণী সংঘের জন্য গভীর শোকের দিন। কারণ এদিনে সংঘের প্রিয় সিস্টার সেলিন পাউলিনা মারান্ডী পার্থিব সকল মায়ার বন্ধন চিরতরে ছিন্ন করে শান্তি রাণী সংঘের মাতৃগৃহে রাত ১:৩০ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শান্তি রাণী সিস্টারস সংঘ এক উজ্জ্বল নক্ষত্রকে হারিয়েছে। তার মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত, মৃত্যুকালে সিস্টারের বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। ২০১১ খ্রিস্টাব্দ থেকে হৃদরোগ, ডায়াবেটিকস ও বিভিন্ন শারীরিক জটিলতায় বেশ কয়েক বার স্ট্রোক করেছিলেন। প্রৈরিতিক সেবা দায়িত্ব পালনের সময় অসুস্থতার কারণে দেশের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় চিকিৎসা সেবা নিয়েছেন যেমন- দিনাজপুর সেন্ট ভিন্‌সেন্ট হাসপাতাল, রাজশাহী, ঢাকা এবং দেশের বাইরে ভারতে। ২০২০ খ্রিস্টাব্দ - ২০২২ খ্রিস্টাব্দ ফেব্রুয়ারি ১৮ তারিখ পযর্ন্ত দিনাজপুর শান্তি রাণী মাতৃগৃহে শয্যাশায়ী ছিলেন।

সংক্ষিপ্ত জীবনী:

১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ জুন মাসের ২০ তারিখে দিনাজপুর ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীর কসবা, বিশপপাড়ায় সিস্টার সেলিন জন্মগ্রহণ করেন। পিতা: মৃত জন দয়া মারান্ডী ও মাতা: মৃত মারীয়া মুরমু। বাবা ছিলেন একজন আদর্শ দক্ষ বাণী প্রচারক। চার ভাই দুই বোন, দুই বোনই স্বর্গবাসী হন। রেখে গেলেন চার ভাই, তিন ভাই ভারতে এবং এক ভাই বাংলাদেশ মণ্ডলীর ধর্মপ্রদেশীয় যাজক মানুয়েল মারান্ডী। বাবা-মার অতি আদরের প্রথম সন্তান সিস্টার সেলিন মারান্ডী এখন পরম পিতার কোলে।

শিক্ষাজীবন ও সংঘ যোগদান:

হাতেখড়ি থেকে শুরু করে এসএসসি পাস করেন সেন্ট ফিলিপস্ হাইস্কুল থেকে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ। সংঘে ব্রত গ্রহণের পর ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে-এইচএসসি ও ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে বি.এ পাস করেন আদর্শ কলেজ, দিনাজপুর, ১৯৮৪ - Spirituality Course- London -এ এবং ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ বাংলাদেশ টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ঢাকা থেকে বিএড প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেন। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ - ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ নভিশিয়েটের শিক্ষা সম্পন্ন করে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ সংঘের প্রথম সন্ন্যাসব্রত ও ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ আজীবন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস জীবনের "রজত জয়ন্তী" উৎসব পালন করেন ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ ছিল সিস্টারের সন্ন্যাস জীবনের ৫০ বছরের জুবিলী বছর।

কর্মময় জীবন:

বাংলাদেশ মণ্ডলীতে তার যথেষ্ট অবদান রয়েছে। দিনাজপুরসহ বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশে প্রৈরিতিক সেবা দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের রুহিয়া ও পাথরঘাটা ধর্মপল্লী, চতরা, লালমনিরহাট, নিরাশী সাব- সেন্টার ও সেন্ট ফিলিপস্ হাই স্কুল এন্ড কলেজের ইংলিশ ভার্শনে শিক্ষকতা করেছেন। খুলনা ধর্মপ্রদেশে শেলাবুনিয়া, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশে বেনীদুয়ার ধর্মপল্লী ও বিশপ হাউজে থেকে রোজারি মিনিস্ট্রী এবং ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশে বনানী মেজর সেমিনারী, ভাদুন হলিক্রশ ফাদারদের ধ্যানাশ্রম ও সর্ব শেষ শান্তি রাণী নার্সারী স্কুল মনিপুরীপাড়ায় শিক্ষকতার সেবা দায়িত্ব পালন করেন।

ব্যক্তিগত জীবন:

ব্যক্তিগত জীবনে সিস্টার সেলিন ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ, আদর্শ সন্ন্যাসব্রতী, নভেনা প্রার্থনায় অত্যন্ত বিশ্বাসী, মা মারীয়ার প্রতি অগাধ বিশ্বাস, বাণী প্রচারের জন্য তার অন্তরে প্রচন্ড আগুন জ্বলত, তিনি ছিলেন নম্র-ভদ্র, কর্তব্যনিষ্ঠ, মিশুক, মিষ্টভাষী, যে কোন বিষয় শিখতে খুবই আগ্রহী। সবচেয়ে প্রিয় সখ ছিল গান গাওয়া। সুমিষ্ঠ কণ্ঠে গান গাইতেন। রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রতি তার ছিল প্রগাঢ় অনুরাগ। তিনি খুব সুন্দর করে উপাসনা ও রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতেন এবং অন্যদেরও গাইতে উৎসাহিত করতেন। জীবনের শেষ সময় গুলোতে তেমন কাউকে চিনতে পারেননি বা অন্য কোন কথার সঠিক উত্তর দিতে পারতেন না, তবে মা মারীয়ার গান নির্ভুলভাবে গাইতে পারতেন। আর কেউ তার কাছে গেলেই হাসিমুখে বলতেন আমার জন্য প্রার্থনা কর, কথাটা বার বার আওড়াতেন। আমরা তার আত্মার চিরশান্তি কামনা করি। তার প্রতি রইল আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা।

বিজ্ঞ/৬৬/২২

১৮তম মৃত্যুবার্ষিকী

"সদা হেসে বলতে কথা দিতে না প্রাণে ব্যথা
মরণের পরে হলে বেদনার স্মৃতিগাঁথা"

তুমি ছিলে, তুমি আছ, তুমি থাকবে আমাদের সবার হৃদয় মাঝে। আমাদের হৃদয় থেকে হারিয়ে যাওনি তুমি। তোমার কথা, হাসিমাখা মুখ, সহজ-সরল জীবন, সৎ নীতিতে অটল, ঈশ্বর নির্ভরশীলতা সব কিছু আমরা এখনও অনুভব করি। তোমার জীবনশিক্ষাই আমাদের জীবন চলার পথের পাথেয়। তোমার অস্তিত্ব সর্বত্র ছড়িয়ে আছে আমাদের জীবন মাঝে।

বিশ্বাস করি, স্বর্গীয় পিতার পাশে তুমি আছ। আমাদের আশীর্বাদ কর যেন ঈশ্বরনির্ভরশীলতা ও তোমার জীবনাদর্শে অতিবাহিত করতে পারি আমাদের অনাগত দিনগুলি।

স্ত্রী : সরোজনী দেশাই
মেয়ে ও মেয়ের স্বামী : মুক্তি-সুনির্মল এবং যুঁথি-পলাশ
ছেলে ও ছেলে বৌ : হেমন্ত দেশাই ও দিবা রোজারিও
নাতি ও নাতনী : আবির, অর্ঘ্য, অপরাজিতা এবং আরোস।

প্রয়াত হরলাল সিপ্রিয়ান দেশাই
জন্ম : ৫ নভেম্বর, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ
বড়ইহাজী, শুলপুর।

লেখা আহ্বান

তপস্যাকালের সংখ্যার জন্য

সম্মানিত পাঠক, লেখকবৃন্দ 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা নিবেন। ২ মার্চ ভস্ম বুধবারের মধ্যদিয়ে শুরু হচ্ছে তপস্যাকাল। এই সময়কালের বিভিন্ন চিন্তা- চেতনা ও অনুপ্রেরণা নিয়ে আপনার লেখাটি শিঘ্রই পাঠিয়ে দিন।

পুনরুত্থান সংখ্যার জন্য

আমরা অতি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, প্রতিবারের ন্যায় এবারও 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী' পুনরুত্থান পর্ব উপলক্ষে প্রকাশ করতে যাচ্ছে বিশেষ সংখ্যা। তাই আপনার বিষয়ভিত্তিক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, উপন্যাস, কলাম, ছোটদের আসর (অংকিত ছবি, গল্প, ছড়া, কবিতা ইত্যাদি), সাহিত্য মঞ্জুরি, খোলা জানালা, পত্রবিতান, মতামত আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিবেন ২৯ মার্চ -এর মধ্যে। উক্ত তারিখের পরে কোন লেখা গ্রহণ করা হবেনা। আপনাদের লেখা দিয়েই সুন্দর ও সৃষ্টিশীল পুনরুত্থান সংখ্যা সাজিয়ে তোলা হবে।
যারা ডাকযোগে এবং ই-মেইল-এ লেখা পাঠাবেন অবশ্যই 'পুনরুত্থান সংখ্যা, বিভাগ... লিখতে ভুলবেন না। ই-মেইল-এ পাঠালে Sutonny ফন্ট এবং Windos 97 এ কনভার্ট করে ই- মেইল-এ বিষয় অবষ্যই 'পুনরুত্থান/ লিখবেন। লেখা প্রকাশের অধিকার একমাত্র সম্পাদক কর্তৃক সংরক্ষিত। - *সম্পাদক*

লেখা পাঠাবার ঠিকানা:
wklypratibeshi@gmail.com

পুনরুত্থান পর্ব উপলক্ষে স্ক্রিপ্ট আহ্বান

বিটিভির ২০২২ খ্রিস্টাব্দের পুনরুত্থান অনুষ্ঠানের জন্য স্ক্রিপ্ট দরকার। প্রভু যিশুর যাতনাভোগ, মৃত্যু ও পুনরুত্থানকে কেন্দ্রে রেখে খ্রিস্টীয় মূল্যবোধসম্পন্ন পঞ্চাশ/পঞ্চান্ন মিনিটের অনুষ্ঠানের জন্য স্ক্রিপ্ট আহ্বান করা হচ্ছে। যেখানে ধর্মীয় গান ও নৃত্যসহ নাট্যাংশ থাকতে পারে। স্ক্রিপ্ট জমা দেবার শেষ তারিখ ৮ মার্চ ২০২২ খ্রিস্টাব্দ।

স্ক্রিপ্ট পাঠানোর ঠিকানা :
পরিচালক, খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০।

বর্ষ ৮২ ❖ সংখ্যা - ০৮
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 08
বর্ষ ৮২ ❖ সংখ্যা - ০৮
Regd. No. DA-33
❖ 27 February - 5 March, 2022, ১৪ - ২০ ফাল্গুন, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

শুলপুর ধর্মপল্লীর প্রতিপালকের পার্বণে সবাইকে আমন্ত্রণ

সুধী,

অতি আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১৯ মার্চ, শনিবার, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের অন্যতম ধর্মপল্লী, শুলপুর ধর্মপল্লীতে প্রতিপালক সাধু যোসেফের পর্ব মহাসমারোহে পালন করা হবে। পর্বের দিন পৌরহিত্য করবেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল আর্চবিশপ বিজয় এনডি'ক্রুজ ওএমআই। তাই শুলপুর ধর্মপল্লীর প্রতিপালক সাধু যোসেফের পার্বণে সবাইকে জানাই আমন্ত্রণ।

সকলের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে ১০ মার্চ থেকে নভেনা প্রার্থনা ও খ্রিস্টযাগ চলবে। এ সময় ও পর্বের সময় আমরা সকলে স্বাস্থ্যবিধি মেনে অংশগ্রহণ করব।
পর্বে পর্বকর্তাদের জন্য শুভেচ্ছা দান ১০০০ (এক হাজার) টাকা মাত্র।
খ্রিস্টযাগের উদ্দেশ্য দান ১৫০ টাকা মাত্র।

পর্বে নভেনার খ্রিস্টযাগ
নভেনা : ১০ - ১৮ মার্চ, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
সকাল : ৬:৩০ মিনিটে
বিকাল : ৪:৩০ মিনিটে

শুভেচ্ছান্তে,
ফাদার লিন্টু ফ্রান্সিস ডি'কস্তা, পাল-পুরোহিত
ও প্যারিস কাউন্সিল এবং খ্রিস্টভক্তগণ
শুলপুর ধর্মপল্লী, মুন্সিগঞ্জ
যোগাযোগের ঠিকানা
০১৭৮৬৯১০১০৯
০১৭৩৩৯১৯৭৮৩

পর্বদিনের খ্রিস্টযাগ
১ম খ্রিস্টযাগ : সকাল ৭টা
২য় খ্রিস্টযাগ : সকাল ৯:৩০ মিনিটে

বি:দ্র: স্থানীয় পাল-পুরোহিতের মাধ্যমেও আপনারা পর্বীয় খ্রিস্টযাগের শুভেচ্ছা দান দিতে পারবেন।

খ্রি/৬২/২০২২

পরমদেশে যাত্রার নবম বর্ষ

আমাদের প্রাণপ্রিয় অতুলনীয়া মাগো,

সময়ের আবর্তে নয়টি বছর অতি দ্রুত চলে গেলেও প্রতিটি মাস, প্রতিটি দিন, প্রতিটি মুহূর্ত তোমাকে আমাদের হৃদয়ে অনুভব ছাড়া অতিবাহিত করতে পারিনি, কারণ তুমি যে রয়েছো আমাদের হৃদয়-মন সমস্ত কিছু জুড়ে। তোমার সদা হাস্যোজ্জ্বল মুখ, সরল মন, তোমার কথাবলা, প্রার্থনাশীল জীবন আমাদেরকে সর্বক্ষণ অনুপ্রাণিত করে। মাগো, আমাদের সুখ-দুঃখ, ভালো লাগা, মন্দ লাগা সবকিছুই তোমার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান ছিল। এই সংসারের মোহ তোমাকে কিছুতেই আকর্ষিত করতে পারেনি।

তোমার মতো একজন মাকে আমাদের জীবনে দান করার জন্য সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। মাগো, তোমার কাছে আমাদের জন্য এবং আমাদের সকল আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের জন্য বিশেষ আশীর্বাদ চাই যেন আমরাও ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে এই পৃথিবীতে বিশ্বস্তভাবে জীবন-যাপন করে একদিন তোমার সাথে পরমদেশে মিলিত হতে পারি।

প্রয়াত লিলি মিরেন্ডা রোজারিও
জন্ম: ১ ডিসেম্বর, ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৪ মার্চ, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ
তেজকুনিপাড়া, ঢাকা।
গ্রাম: করান, নাগরী।

তোমার আশীর্বাদে গড়া পরিবার,
স্বামী: বাদল বেঞ্জামিন রোজারিও
তিন মেয়ে: লিভা, লিমা ও লিন্ডা রোজারিও
মেয়ে জামাই: কেনেট ক্রুশ, অনাদি বিশ্বাস ও নালাকা ননিজ
নাতনী: পুষ্পিতা, ভিওলা ও জেনিসা
নাতি: অলিভার বিশ্বাস

খ্রি/৬১/২০২২

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org